

আনন্দ যঠ।



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

Bankim Chandra Press : Calcutta,
1897.

মূল্য ১।। টাকা।

R.M.I.C.	AR
Acc. No.	50272
	891 443
Class No.	— 677A
Date	23.5.63
Hand	A.M.
	✓
Chk	✓
Bk Card	AC
Checked	Am

PRINTED BY NANDA LALL BARA.

BANKIM CHANDRA PRESS,

No. 4, College Square, Calcutta.



PUBLISHED BY UMACHARAN BANERJEE,
, Pratap Chandra Chatterjee's Lane, Calcutta

উৎসর্গ ।

—०○०—

* * *

কু নু মাং ত্বদধীনজীবিতং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো
জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ ॥

* * *

স্বর্গে মর্ত্যে সম্বন্ধ আছে । সেই সম্বন্ধ রাখিবার
এই গ্রন্থের এরূপ উৎসর্গ হইল ।

যে তু সৰ্ব্বানি কৰ্ম্মানি ময়ি সংশ্ৰুত্ব মংপরাঃ
অনন্তো নৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ।
তেষামহং সমুদ্বৰ্ত্তা যুতাসংসারমাগরাৎ
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ।
মযোব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়
নিবসিষ্যসি মযোব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ।
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্ৰোষি ময়ি স্থিরং
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় !

শ্ৰীমদ্ভগবদ্গীতা । ১২শ অধ্যায় ।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন ।

বাঙ্গালীর স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায় । অনেক সময় নয় ।

সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র । বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী ।

ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ।

এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল ।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন ।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার টীকাস্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা অপর পৃষ্ঠে উদ্ধৃত করিলাম ।

The leading idea of the plot is this—should the national mind feel justified in harbouring violent thoughts against the British Government ? or to present the question in another form, is the establishment of English supremacy providential in any sense ? or to put it in a still more final and conclusive form, with what purpose and with what immediate end in view did providence send the British to this country ? The immediate object is thus briefly described in the preface—To put an end to Moslem tyranny and anarchy in Bengal ; and the mission is thus strikingly pictured in the last chapter :—“The Physician said, Satyanand, be not crest fallen. Whatever is, is for the best. It is so written that the English should first rule over the country before there could be a revival of the Aryan faith. Harken unto the counsels of Providence. The faith of the Aryas consisteth not in the worship of three hundred and thirty millions of gods and goddesses ; as a matter of fact that is a popular degradation of religion—that which has brought about the death of the true Arya faith, the so-called Hinduism of the Mlechhas. True Hinduism is grounded on knowledge, and not on works. Knowledge is of two kinds—external and internal. The internal knowledge constitutes the chief part of Hinduism. But internal knowledge cannot grow unless there is a development of the external knowledge. The spiritual cannot be known unless you know the material. External knowledge has for a long time disappeared

from the country, and with it has vanished the Arya faith. To bring about a revival, we should first of all disseminate physical or external knowledge. Now there is none to teach that; we ourselves cannot teach it. We must needs get it from other countries. The English are profound masters of physical knowledge, and they are apt teachers too. Let us then make them kings. English education will give our men a knowledge of physical science, and this will enable them to grapple with the problems of their inner nature. Thus the chief obstacles to the dissemination of Arya faith will be removed, and true religion will sparkle into life spontaneously and of its own accord. The British Government shall remain indestructible so long as the Hindus do not once more become great in knowledge, virtue and power. Hence O Wise man, refrain from fighting and follow me." This passage embodies the most recent and the most enlightened views of the educated Hindus, and happening as it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good. The author's dictum we heartily accept as it is one which already forms the creed of English education. We may state it in this form: India is bound to accept the scientific method of the west and apply it to the elucidation of all truth. This idea beautifully expressed, forms a silver thread as it were, and runs through the tissue of the whole work.

The Liberal,
8th April, 1882.

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন ।

এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসীবিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল । পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল ।

আরও দেখিবেন, যে দুইটা ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে । যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল । আর CAPTAIN EDWARDES নামের পরিবর্তে MAJOR WOOD নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল । এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না—কেন না উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে ।

পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন ।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপনে যে অনৈক্যের কথা লেখা গিয়াছে, তাহা রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিয়া, এই সংস্করণে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করা গেল । অন্যান্য বিষয়েও কিছু কিছু পরিবর্তন করা গিয়াছে । শান্তিকে অপেক্ষাকৃত শান্ত করা গিয়াছে । এবং তৎসম্বন্ধে যে কথাটা অনুভবে বুঝিবার ভার পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নূতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া গেল । মুদ্রাক্ষন কার্য্যও পূর্ব্বাপেক্ষা সুসম্পাদিত করা গেল ।



আনন্দ মঠ ।

উপক্রমণিকা ।

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেকজাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য আলোকপ্রবেশের পথমাত্র শূন্য; এইরূপ পল্লবের অনন্তসমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের পর ক্রোশ, পবনে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনাকার। মধ্যাহ্নেও আলোক অক্ষুট, ভয়ানক! তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য। তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার; কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের স্তায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তরু। কত লক্ষ লক্ষ কোটা কোটা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়— শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তরুভাব অনুভব করা যাইতে পারে না।

সেই অনন্তশূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তরু মধ্যে শব্দ হইল, “আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?”

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তরুকে ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্তরু মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল, “আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?”

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, “তোমার পণ কি?”

প্রত্যুত্তরে বলিল “পণ আমার জীবনসর্বস্ব।”

প্রতিশব্দ হইল, “জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।”

“আর কি আছে? আর কি দিব।”

তখন উত্তর হইল, “ভক্তি”।

প্রথম খণ্ড ।





প্রথম খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ১

১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃগ্ময় গৃহ, মধ্য মধ্য উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষকেরা বাহির হয় নাই। তস্তবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু জোড়ে করিয়া

কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপকে টোল বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না, গোচারণে গোরু দেখি না, কেবল শ্মশানে শৃগাল কুকুর। এক বৃহৎ অট্টালিকা— তাহার বড় বড় ছড়ওয়াল খাম দূর হইতে দেখা যায়—সেই গৃহারণ্যমধ্যে শৈলশিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি, তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহে মনুষ্যসমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ু-প্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময়। তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুলকুম্বুসুগলবৎ এক দম্পতী বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মনস্তর।

১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, স্মতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গায়িল, কৃষকপত্নী আবার রূপার পৈঁচার জন্ত স্বামীর কাছে দৌরাভ্যা আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধাত্ত সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল, যাহার ডুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্ত কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে একসন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর একসন্ধ্যা আদপেটা করিয়া

খাইতে লাগিল, তার পর ছুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল।

লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়!—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল। জোত জমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদদার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্তেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাচুর্য হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে। কেহ কাহার চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকার মধ্যে

আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।

মহেন্দ্র সিংহ পদচিহ্ন গ্রামে বড় ধনবান্—কিন্তু আজ ধনী নির্ধনের এক দর। এই দুঃখপূর্ণকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী সকলেই গিয়াছে। কেহ মরিয়াছে, কেহ পলাইয়াছে। সেই বহুপরিবারমধ্যে এখন তাঁহার ভার্য্যা ও তিনি স্বয়ং আর এক শিশুকণ্ঠা। তাঁহাদেরই কথা বলিতেছিলাম।

তাঁহার ভার্য্যা কল্যাণী চিন্তা ত্যাগ করিয়া গো-শালে গিয়া স্বয়ং গো-দোহন করিলেন। পরে দুগ্ধ তপ্ত করিয়া কন্যাকে খাওয়াইয়া গোরুকে ঘাস জল দিতে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে মহেন্দ্র বলিল, “এরূপে কদিন চলিবে?”

কল্যাণী বলিল, “বড় অধিক দিন নয়। যতদিন চলে; আমি যতদিন পারি চালাই, তার পর তুমি মেয়েটি লইয়া, সহরে যাইও।”

মহেন্দ্র। সহরে যদি যাইতে হয় তবে, তোমায় বা কেন এত দুঃখ দিই। চল না এখনই যাই।

পরে দুই জনে অনেক তর্ক বিতর্ক হইল।

ক। সহরে গেলে কিছু বিশেষ উপকার হইবে কি?

ম। সে স্থান হয় ত এমনি জনশূন্য, প্রাণরক্ষার উপায় শূন্য হইয়াছে।

ক। মুরশিদাবাদ, কাশিম বাজার বা কলিকাতায় গেলে প্রাণরক্ষা হইতে পারিবে। এস্থান ত্যাগ করা সকল প্রকারে কর্তব্য।

মহেন্দ্র বলিল, “এই বাড়ী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধনে পরিপূর্ণ ; ইহা যে সব চোরে লুণ্ঠিয়া লইবে।”

ক। লুণ্ঠিতে আসিলে আমরা কি ছই জনে রাখিতে পারিব ? প্রাণে না বাঁচিলে ধন ভোগ করিবে কে ? চল এখনও বন্ধ সন্ধ করিয়া যাই। যদি প্রাণে বাঁচি ফিরিয়া আসিয়া ভোগ করিব।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি ? বেহারা ত সব মরিয়া গিয়াছে, গোক আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোক নাই।”

ক। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিও না।

কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তবু ত ইহারা ছইজন বাঁচিবে।

পরদিন প্রভাতে ছইজনে কিছু অর্থ সঙ্গে লইয়া, ঘরদ্বারের চাবি বন্ধ করিয়া, গোকগুলি ছাড়িয়া দিয়া, কণ্ঠাটিকে কোলে লইয়া, রাজধানীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, “পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত লুণ্ঠেড়া ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।” এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, “যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার স্কুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।” এই বলিয়া কল্যাণী কণ্ঠাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মহেন্দ্র বলিলেন, “তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে ?”

কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কোঁটা বস্ত্রমধ্যে

লুকাইল । দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন ।

জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রৌদ্র, পৃথিবী অগ্নিময়, বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে, আকাশ তপ্ত তাঁমার চাঁদোয়ার মত, পথের ধূলি সকল অগ্নিস্কুলিঙ্গবৎ । কল্যাণী ঘামিতে লাগিল, কখনও বাবলা গাছের ছায়ায়, কখনও খেজুর গাছের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া, শুষ্ক পুষ্করিণীর কর্দমময় জল পান করিয়া কত কষ্টে পথ চলিতে লাগিল । মেয়েটি মহেন্দ্রের কোলে—এক একবার মহেন্দ্র মেয়েকে বাতাস দেয় । একবার এক নিবিড় শ্রামলপত্ররঞ্জিত সুগন্ধকুসুমসংযুক্ত লতাবেষ্টিত বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া দুইজনে বিশ্রাম করিল । মহেন্দ্র কল্যাণীর শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন । বস্ত্র ভিজাইয়া মহেন্দ্র নিকটস্থ পল্লব হইতে জল আনিয়া আপনার ও কল্যাণীর মুখে, হাতে, পায়ে, কপালে সিঞ্চন করিলেন ।

কল্যাণী কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু দুইজনে ক্ষুধায় বড় আকুল হইলেন । তাও সহ হয়—মেয়েটির ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ হয় না । অতএব আবার তাঁহারা পথ বাহিয়া চলিলেন । সেই অগ্নিতরঙ্গ সস্তরণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে এক চটীতে পৌঁছিলেন । মহেন্দ্রের মনে মনে বড় আশা ছিল, চটীতে গিয়া স্ত্রী কন্যার মুখে শীতল জল দিতে পারিবেন, প্রাণরক্ষার জন্ত মুখে আহার দিতে পারিবেন । কিন্তু কই? চটীতে ত মনুষ্য নাই! বড় বড় ঘর পড়িয়া আছে, মানুষ সকল পলাইয়াছে । মহেন্দ্র ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্ত্রী কন্যাকে একটা ঘরের ভিতর শোয়াইলেন । বাহির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক হাঁক করিতে

লাগিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না। তখন মহেন্দ্র কল্যাণীকে বলিলেন, একটু তুমি সাহস করিয়া একা থাক, দেশে যদি গাই থাকে, শ্রীকৃষ্ণ দয়া করুন, আমি দুধ আনিব। এই বলিয়া একটা মাটির কলসী হাতে করিয়া মহেন্দ্র নিজগাম্ভ হইলেন। কলসী অনেক পড়িয়া ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

মহেন্দ্র চলিয়া গেল। কল্যাণী একা বালিকা লইয়া সেই জনশূন্যস্থানে প্রায়-অন্ধকার কুটারমধ্যে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে বড় ভয় হইতেছিল। কেহ কোথাও নাই, মনুষ্যমাত্রের কোন শব্দ পাওয়া যায় না, কেবল শৃগাল কুকুরের রব। ভাবিতে ছিলেন, কেন তাঁহাকে যাইতে দিলাম, না হয় আর কিছুক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতাম। মনে করিলেন চারিদিকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসি। কিন্তু একটি দ্বারেও কপাট বা অর্গল নাই। এইরূপ চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ দ্বারে একটা কি ছায়ার মত দেখিলেন। মনুষ্যাকৃতি বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যও বোধ হয় না। অতিশয় শুষ্ক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উলঙ্গ, বিকটাকার মনুষ্যের মত কি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে সেই ছায়া যেন একটা হাত তুলিল, অস্থিচর্মবিশিষ্ট, অতি দীর্ঘ, শুষ্ক হস্তের দীর্ঘ শুষ্ক অঙ্গুলি দ্বারা কাহাকে যেন সঙ্কত করিয়া ডাকিল। কল্যাণীর

প্রাণ শুকাইল। তখন সেইরূপ আর একটা ছায়া—গুরু, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ,—প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তার পর একটা আসিল। তার পর আরও একটা আসিল। কত আসিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই প্রায়-অন্ধকার গৃহ নিশীথ-শশানের মত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন সেই প্রেতবৎ মূর্তি সকল কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী প্রায় মূর্ছিতা হইলেন। কৃষ্ণবর্ণ শীর্ণ পুরুষেরা তখন কল্যাণী এবং তাঁহার কন্যাকে ঘিরিয়া তুলিয়া, গৃহের বাহির করিয়া, মাঠ পার হইয়া এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্র কলসী করিয়া ত্রুণ লইয়া সেই খানে উপস্থিত হইল। দেখিল কেহ কোথাও নাই, ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কন্যার নাম ধরিয়া, শেষে স্ত্রীর নাম ধরিয়া অনেক ডাকিল, কোন উত্তর, কোন সন্ধান পাইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

যে বনমধ্যে দস্যুরা কল্যাণীকে নামাইল সে বন অতি মনোহর। আলো নাই, শোভা দেখে এমন চক্ষুও নাই, দরিদ্রের হৃদয়াস্তর্গত সৌন্দর্যের ন্যায় সে বনের সৌন্দর্য্য অদৃষ্ট রহিল। দেশে আহার থাকুক বা না থাকুক—বনে ফুল আছে, ফুলের গন্ধে সে অন্ধকারেও আলো বোধ হইতেছিল। মধ্যে

পরিষ্কৃত সুকোমল শষ্পাবৃত ভূমিখণ্ডে দস্যুরা কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে নামাইল। তাহারা তাঁহাদিগকে ঘি।। বসিল। তখন তাহারা বাদানুবাদ করিতে লাগিল যে ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়—যে কিছু অলঙ্কার কল্যাণীর সঙ্গে ছিল, তাহা পূর্বেই তাহারা হস্তগত করিয়াছিল। একদল তাহার বিভাগে ব্যতিব্যস্ত। অলঙ্কারগুলি বিভক্ত হইলে, এক জন দস্যু বলিল, “আমরা সোণা রূপা লইয়া কি করিব, একখানা গহনা লইয়া কেহ আমাকে এক মুটা চাল দাও, ক্ষুধায় প্রাণ যায়—আজ কেবল গাছের পাতা খাইয়া আছি।” এক জন এই কথা বলিলে সকলেই সেইরূপ বলিয়া গোল করিতে লাগিল। “চাল দাও”, “চাল দাও”, “ক্ষুধায় প্রাণ যায়, সোণারূপা চাহি না।” দলপতি তাঁহাদিগকে থামাইতে লাগিল, কিন্তু কেহ থামে না, ক্রমে উচ্চ উচ্চ কথা হইতে লাগিল, গালাগালি হইতে লাগিল, মারামারির উপক্রম। যে, যে অলঙ্কার ভাগে পাইয়াছিল, সে, সে অলঙ্কার রাগে তাহার দলপতির গায়ে ছুড়িয়া মারিল। দলপতি দুই এক জনকে মারিল, তখন সকলে দলপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। দলপতি অনাহারে শীর্ণ এবং ক্লিষ্ট ছিল, দুই এক আঘাতেই ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদের মধ্যে এক জন বলিল, “শৃগাল কুকুরের মাংস খাইয়াছি, ক্ষুধায় প্রাণ যায়, এস ভাই আজ এই বেটাকে খাই।” তখন সকলে “জয় কালী!” বলিয়া, উচ্চনাদ করিয়া উঠিল। “বম্ কালী! আজ নরমাংস খাইব!” এই বলিয়া সেই বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্তিসকল অন্ধকারে খল খল

হাস্ত করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। দল-পতির দেহা পোড়াইবার জন্য একজন অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। শুষ্ক লতা, কাষ্ঠ, তৃণ আহরণ করিয়া চক্ৰমকি সোলায় আগুন করিয়া, সেই তৃণকাষ্ঠ জ্বালিয়া দিল। তখন অল্প অল্প অগ্নি জ্বলিতে জ্বলিতে পার্শ্ববর্তী আম্র, জম্বীর, পনস, তাল, তিস্তিড়ী, খজুর প্রভৃতি শ্রামল পল্লবরাজি, অল্প অল্প প্রভাসিত হইতে লাগিল। কোথাও পাতা আলোতে জ্বলিতে লাগিল, কোথাও ঘাস উজ্জল হইল। কোথাও অন্ধকার আরও গাঢ় হইল। অগ্নি প্রস্তুত হইলে, একজন মৃতশবের পা ধরিয়া টানিয়া আগুনে ফেলিতে গেল। তখন আর একজন বলিল, “রাখ, রও, রাখ, রও, যদি মহামাংস খাইয়াই আজ প্রাণ রাখিতে হইবে, তবে এই বুড়ার শুকন মাংস কেন খাই? আজ যাহা লুঠিয়া আনিয়াছি তাহাই খাইব; এস ঐ কচি মেয়েটাকে পোড়াইয়া খাই।” আর একজন বলিল, “যাহা হয় পোড়া বাপু, আর ক্ষুধা সয় না” তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্ঠা লইয়া শুইয়া ছিল, সেই দিকে চাহিল। দেখিল যে, সে স্থান শূন্য, কন্ঠাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় স্বেয়োগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্ঠা কোলে করিয়া কন্ঠার মুখে স্তনটী দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া মার মার শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্ত্তি দস্যুদল চারিদিকে ছুটিল। অবস্থা বিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বন অত্যন্ত অন্ধকার, কল্যাণী তাহার ভিতর পথ পায় না ।
 বৃক্ষলতাকণ্টকের ঘনবিন্যাসে একে পথ নাই, তাহাতে আবার
 ঘনান্ধকার । বৃক্ষলতাকণ্টক ভেদ করিয়া কল্যাণী বনমধ্যে
 প্রবেশ করিতে লাগিলেন । মেয়েটির গায়ে কাঁটা ফুটিতে
 লাগিল, মেয়েটি মধ্যে মধ্যে কাঁদিতে লাগিল, শুনিয়া
 দস্যুরা আরও চীৎকার করিতে লাগিল । কল্যাণী এইরূপে
 ক্রধিরাক্তকলেবর হইয়া অনেকদূর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।
 ক্লিষ্টকণ পরে চন্দ্রোদয় হইল । এতক্ষণ কল্যাণীর মনে কিছু
 ভরসা ছিল যে, অন্ধকারে তাঁহাকে দস্যুরা দেখিতে পাইবে
 না, ক্লিষ্টকণ খুঁজিয়া নিরস্ত হইবে; কিন্তু এক্ষণে
 চন্দ্রোদয় হওয়ায় সে ভরসা গেল । চাঁদ আকাশে উঠিয়া
 বনের মাথার উপর আলো ঢালিয়া দিল—ভিতরে বনের
 অন্ধকার, আলোতে ভিজিয়া উঠিল । অন্ধকার উজ্জল হইল ।
 মাঝে মাঝে ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো বনের ভিতর প্রবেশ
 করিয়া, উকি ঝুকি মারিতে লাগিল । চাঁদ যত উঁচুতে উঠিতে
 লাগিল, তত আরও আলো বনে ঢুকিতে লাগিল, অন্ধকার
 সকল আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিল । কল্যাণী কন্যা
 লইয়া আরও বনের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন । তখন
 দস্যুরা আরও চীৎকার করিয়া চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতে
 লাগিল—কত্যাটি ভয় পাইয়া আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে

লাগিল। কল্যাণী তখন নিরস্ত হইয়া আর পলায়নের চেষ্টা করিলেন না। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে কণ্টকশূন্য তৃণময় স্থানে বসিয়া কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, “কোথায় তুমি! যাহাকে আমি নিত্য পূজা করি, নিত্য নমস্কার করি, যাহার ভরসায় এই বনমধ্যেও প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম, কোথায় তুমি হে মধুসূদন!” এই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধা তৃষ্ণার অবসাদে, কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সোরে।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

কল্যাণী বাল্যকালাবধি পুরাণে শুনিয়াছিলেন, যে দেবর্ষি গগনপথে বীণাযন্ত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুবন ভ্রমণ করিয়া থাকেন; তাঁহার মনে সেই কল্পনা জাগরিত হইতে লাগিল। মনে মনে দেখিতে লাগিলেন, শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, মহাশরীর মহামুনি বীণাহস্তে চন্দ্রালোকপ্রদীপ্ত নীলাকাশপথে গায়িতেছেন,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

ক্রমে গীত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, আরও স্পষ্ট শুনিতে লাগিলেন,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

ক্রমে আরও নিকট—আরও স্পষ্ট—

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে।”

শেষে কল্যাণীর মাথার উপর বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করিয়া
গীত বাজিল,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

কল্যাণী তখন নয়নোন্মীলন করিলেন । সেই অর্ধফুট
বনাস্ককারবিমিশ্র চন্দ্ররশ্মিতে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্র-
শরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন, ঋষিমূর্তি ! অন্যমনে
তথাভূতচেতনে কল্যাণী মনে করিলেন প্রণাম করিব, কিন্তু
প্রণাম করিতে পারিলেন না, মাথা নোয়াইতে একেবারে
চেতনাশূন্য হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

সেই বনমধ্যে এক প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ডে ভগ্নশিলাখণ্ড সকলে
পরিবেষ্টিত হইয়া একটি বড় মঠ আছে । পুরাণতত্ত্ববিদেরা
দেখিলে বলিতে পারিতেন, ইহা পূর্বকালে বৌদ্ধদিগের বিহার
ছিল—তার পরে হিন্দুর মঠ হইয়াছে । অট্টালিকাশ্রেণী দ্বিতল
—মধ্যে বহুবিধ দেবমন্দির এবং সম্মুখে নাটমন্দির । সকলই
প্রায় প্রাচীরে বেষ্টিত আর বহিঃস্থিত বন্যবৃক্ষশ্রেণী দ্বারা এরূপ
আচ্ছন্ন যে দিনমাণে অনতিদূর হইতেও কেহ বুঝিতে পারে
না, যে এখানে কোঠা আছে । অট্টালিকা সকল অনেক
স্থানেই ভগ্ন কিন্তু দিনমাণে দেখা যায় যে সকল স্থান সম্প্রতি

মেরামত হইয়াছে। দেখিলেই জানা যায়, যে এই গভীর দুর্ভেদ্য অরণ্যমধ্যে মনুষ্য বাস করে। এই মঠের একটি কুঠারী মধ্যে একটা বড় কুঁদো জ্বলিতেছিল, তাহার ভিতর কল্যাণীর প্রথম চৈতন্য হইলে দেখিলেন, সম্মুখে সেই শুভ্রশরীর, শুভ্রবসন, মহাপুরুষ। কল্যাণী বিস্মিতলোচনে আবার চাহিতে লাগিলেন, এখনও স্মৃতি পুনরাগমন করিতেছিল না। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, “মা এ দেবতার ঠাই, শঙ্কা করিও না। একটু দুধ আছে তুমি খাও, তার পর তোমার সহিত কথা কহিব।”

কল্যাণী প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তার পর ক্রমে ক্রমে মনের কিছু স্মৃতি হইলে, গলায় আঁচল দিয়া সেই মহাত্মাকে একটি প্রণাম করিলেন। তিনি সুমঙ্গল আশীর্বাদ করিয়া গৃহান্তর হইতে একটি সুগন্ধ মৃৎপাত্র বাহির করিয়া সেই জ্বলন্ত অগ্নিতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিলেন। দুগ্ধ তপ্ত হইলে কল্যাণীকে তাহা দিয়া বলিলেন,

“মা, কন্যাকে কিছু খাওয়াও আপনি কিছু খাও, তাহার পর কথা কহিব।” কল্যাণী হৃষ্টচিত্তে কন্যাকে দুগ্ধপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষ “আমি যতক্ষণ না আসি, কোন চিন্তা করিও না” বলিয়া মন্দির হইতে বাহিরে গেলেন। বাহির হইতে কিয়ৎকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে কল্যাণী কন্যাকে দুধ খাওয়ান সমাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু আপনি কিছু খান নাই; দুগ্ধ যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে, অতি অল্পই ব্যয় হইয়াছে। সেই পুরুষ তখন বলিলেন, “মা তুমি দুধ খাও নাই, আমি আবার বাহিরে যাইতেছি, তুমি দুধ না খাইলে ফিরিব না।”

দিয়া ঋষিতুল্য পুরুষ এই বলিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, কল্যাণী ক্রমাবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যোড়হাত করিলেন—

বনবাসী বলিলেন, “কি বলিবে ?”

তখন কল্যাণী বলিলেন, “আমাকে দুধ খাইতে আজ্ঞা করিবেন না—কোন বাধা আছে। আমি খাইব না।”

তখন বনবাসী অতি করুণস্বরে বলিলেন, “কি বাধা আছে আমাকে বল—আমি বনবাসী ব্রহ্মচারী, তুমি আমার কন্যা, তোমার এমন কি কথা আছে যে আমাকে বলিবে না? আমি যখন বন হইতে তোমাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া আনি, তৎকালে তোমাকে অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা বোধ হইয়াছিল, তুমি না খাইলে বাঁচিবে কি প্রকারে?”

কল্যাণী তখন গলদশ্রলোচনে বলিলেন, “আপনি দেবতা আপনাকে বলিব—আমার স্বামী এপর্যন্ত অভুক্ত আছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইলে, কিম্বা তাঁহার ভোজনসংবাদ না শুনিলে, আমি কি প্রকারে খাইব?”

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার স্বামী কোথায়?”

কল্যাণী বলিলেন, “তাহা আমি জানি না—তিনি দুধের সন্ধানে বাহির হইলে পর দস্যুরা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে।” তখন ব্রহ্মচারী একটা একটা করিয়া প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী এবং তাঁহার স্বামীর বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত হইলেন। কল্যাণী স্বামীর নাম বলিলেন না, বলিতে পারেন না, কিন্তু আর আর পরিচয়ের পরে ব্রহ্মচারী বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমিই মহেন্দ্রের পত্নী?” কল্যাণী নিরুত্তর হইয়া যে অগ্নিতে দুগ্ধ তপ্ত হইয়াছিল, অবনতমুখে তাহাতে

কাষ্ঠপ্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, “তুমি গভীর বাক্য পালন কর, দুগ্ধ পান কর, আমি তোমার স্বামী? কুঠারী আনিতেছি। তুমি দুধ না খাইলে আমি যাইব না” কল্যাণীর বলিলেন, “একটু জল এখানে আছে কি?” ব্রহ্মচারী, শুভ্রবসন, দেখাইয়া দিলেন। কল্যাণী অঞ্জলি পাতির্লেন, গিলেন, অঞ্জলি পুরিয়া জল ঢালিয়া দিলেন। কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি ব্রহ্মচারীর পদমূলে লইয়া গিয়া বলিলেন “আপনি ইহাতে পদরেণু দিন।” ব্রহ্মচারী অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা জল স্পর্শ করিলে কল্যাণী সেই জলাঞ্জলি পান করিলেন এবং বলিলেন, “আমি অমৃত পান করিয়াছি—আর কিছু খাইতে বলিবেন না—স্বামীর সংবাদ না পাইলে আর কিছু খাইব না।” ব্রহ্মচারী তখন বলিলেন, “তুমি নির্ভয়ে এই দেউল মধ্যে অবস্থিতি কর, আমি তোমার স্বামীর সন্ধানে চলিলাম।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অনেক। চাঁদ মাথার উপর। পূর্ণচন্দ্র নহে, আলো তত প্রখর নহে। এক অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর সেই অন্ধকারের ছায়াবিশিষ্ট অস্পষ্ট আলো পড়িয়াছে। সে আলোতে মাঠের এপার ওপার দেখা যাইতেছে না। মাঠে কি আছে, কে আছে দেখা যাইতেছে না। মাঠে যেন অনন্ত জনশূন্য, ভয়ের আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই

দিয়া মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা যাইবার রাস্তা । রাস্তার কল্যাণী টি ক্ষুদ্র পাহাড় । পাহাড়ের উপর অনেক আশ্রয় বনবাঁছের মাথা সকল, চাঁদের আলোতে উজ্জ্বল হইয়া তখন রিয়া কাঁপিতেছে । তাহার ছায়া কালো পাথরের করিবেন্দালো হইয়া তরতর করিয়া কাঁপিতেছে । ব্রহ্মচারী সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিখরে স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—কি শুনিতে লাগিলেন বলিতে পারি না । সেই অনন্ততুল্য প্রান্তরেও কোন শব্দ নাই—কেবল বৃক্ষাদির মর্ম্মর শব্দ । এক স্থানে পাহাড়ের মূলের নিকটে বড় জঙ্গল । উপরে পাহাড়, নীচে রাজপথ, মধ্যে সেই জঙ্গল । সেখানে কি শব্দ হইল বলিতে পারি না—ব্রহ্মচারী সেই দিকে গেলেন । নিবিড় জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, সেই বনমধ্যে বৃক্ষরাজির অন্ধকার তলদেশে সারি সারি গাছের নীচে মানুষ বসিয়া আছে । মানুষ সকল দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র, বিটপবিচ্ছেদে নিপতিত জ্যোৎস্নায়, তাহাদের মার্জিত আয়ুধ সকল জ্বলিতেছে । এমন দুই শত লোক বসিয়া আছে—একটা কথাও কহিতেছে না । ব্রহ্মচারী ধীরে ধীরে তাহা-দিগের মধ্যে গিয়া কি একটা ইঙ্গিত করিলেন—কেহ উঠিল না, কেহ কথা কহিল না, কেহ কোন শব্দ করিল না । তিনি সকলের সম্মুখ দিয়া সকলকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, অন্ধকারে মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গেলেন, যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন পাইতেছেন না । খুঁজিয়া খুঁজিয়া একজনকে চিনিয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিত করিলেন । ইঙ্গিত করিতেই সে উঠিল । ব্রহ্মচারী তাহাকে লইয়া দূরে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই ব্যক্তি যুবাপুরুষ—ঘনকৃষ্ণ ৭৮শ্রী।
শ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত—সে বলিষ্ঠকায়, অতি সুন্দর
পুরুষ। সে গৈরিক বসন পরিধান করিয়াছে—সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-
শোভা। ব্রহ্মচারী তাহাকে বলিলেন, “ভবানন্দ, মহেন্দ্র সিংহের
কোন সংবাদ রাখ ?”

ভবানন্দ তখন বলিল, “মহেন্দ্র সিংহ আজ প্রাতে স্ত্রী কন্যা
লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, চটীতে—”

এই পর্য্যন্ত বলাতে ব্রহ্মচারী বলিলেন “চটীতে যাহা
ঘটিয়াছে তাহা জানি। কে করিল ?”

ভবা। গেরো চাষালোক বোধ হয়। এখন সকল গ্রামের
চাষাভুষো পেটের জ্বালায় ডাকাত হইয়াছে। আজ কাল
কে ডাকাত নয় ? আমরা আজ লুঠিয়া খাইয়াছি—কোতোয়াল
সাহেবের দুই মণ চাউল যাইতেছিল—তাহা গ্রহণ করিয়া
বৈষ্ণবের ভোগে লাগাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী হাসিয়া বলিলেন, “চোরের হাত হতে আমি
তাহার স্ত্রী কন্যাক উদ্ধার করিয়াছি। এখন তাহাদিগকে
মঠে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার উপর ভার যে
মহেন্দ্রকে খুঁজিয়া তাহার স্ত্রী কন্যা তাহার জিন্মা করিয়া দাও।
এখানে জীবানন্দ থাকিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে।”

ভবানন্দ স্বীকৃত হইলেন। ব্রহ্মচারী তখন স্থানান্তরে
গেলেন। ✓

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

চটীতে বসিয়া ভাবিয়া কোন ফলোদয় হইবে না বিবেচনা করিয়া মহেন্দ্র গাত্রোথান করিলেন । নগরে গিয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তায় স্ত্রী কণ্ঠার অনুসন্ধান করিবেন এই বিবেচনায় সেই দিকেই চলিলেন । কিছু দূর গিয়া পশ্চিমধ্যে দেখিলেন, কতকগুলি গোরুর গাড়ী ঘেরিয়া অনেকগুলি সিপাহী চলিয়াছে ।

১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই । ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান । তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কোন ভার লয়েন নাই । তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাদম বিশ্বাসহতা মনুষ্যকুল-কলঙ্ক মীরজাফরের উপর । মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে ? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায় । ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেম্পাচ্ লেখে । বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায় ।

অতএব বাঙ্গালার কর ইংরেজের প্রাপ্য । কিন্তু শাসনের ভার নবাবের উপর । যেখানে যেখানে ইংরেজেরা আপনাদের প্রাপ্য কর আপনারা আদায় করিতেন, সেখানে তাঁহারা এক এক কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু খাজানা আদায় হইয়া কলিকাতায় যায় । লোক না খাইয়া মরুক, খাজানা

আদায় বন্ধ হয় না। তবে তত আদায় হইয়া উঠে নাই—
 কেন না মাতা বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে
 পারে না। যাহা হউক, যাহা কিছু আদায় হইয়াছে, তাহা
 গাড়ী বোঝাই হইয়া সিপাহীর পাহারায় কলিকাতায় কোম্পা-
 নির ধনাগারে যাইতেছিল। আজিকার দিনে দস্যুভীতি
 অতিশয় প্রবল, এজন্য পঞ্চাশ জন সশস্ত্র সিপাহী গাড়ীর অগ্র-
 পশ্চাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া যাইতেছিল।
 তাহাদিগের অধ্যক্ষ একজন গোরা। গোরা সর্বপশ্চাৎ
 ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছিল। রৌদ্রের জন্য দিনে সিপাহীরা
 পথে চলে না, রাত্রে চলে। চলিতে চলিতে সেই খাজানার
 গাড়ী ও সৈন্য সামন্তে মহেন্দ্রের গতিরোধ হইল। মহেন্দ্র
 সিপাহী ও গোরুর গাড়ী কর্তৃক পথ রুদ্ধ দেখিয়া, পাশ দিয়া
 দাঁড়াইলেন। তথাপি সিপাহীরা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া যায়—
 দেখিয়া এবং এ বিবাদের সময় নয় বিবেচনা করিয়া—তিনি
 পথিপার্শ্বস্থ জলের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন একজন সিপাহী বলিল, “এহি একঠো ডাকু ভাগতা
 হৈ।” মহেন্দ্রের হাতে বন্দুক দেখিয়া এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ়
 হইল। সে তাড়াইয়া গিয়া মহেন্দ্রের গলা ধরিল। এবং
 “শালা—চোর—” বলিয়াই সহসা এক ঘুসা মারিল, ও বন্দুক
 কাড়িয়া লইল। মহেন্দ্র রিক্ত হস্তে কেবল ঘুসাটি ফিরাইয়া
 মারিলেন। মহেন্দ্রের একটু রাগ যে বেশী হইয়াছিল তাহা
 ধলা বাহুল্য। ঘুসাটি খাইয়া সিপাহী মহাশয় ঘুরিয়া অচেতন
 হইয়া রাস্তায় পড়িলেন। তখন তিন চারিজন সিপাহী
 আসিয়া মহেন্দ্রকে ধরিয়া জোরে টানিয়া সেনাপতি সাহেবের

নিকট লইয়া গেল, এবং সাহেবকে বলিল যে, এই ব্যক্তি একজন সিপাহীকে খুন করিয়াছে। সাহেব পাইপ খাইতে ছিলেন, মদের ঝোঁকে একটু খানি বিহ্বল ছিলেন, বলিলেন, “শালাকো পাকড়লেকে সাদি করো।” সিপাহীরা বুঝিতে পারিল না যে, বন্দুকধারী ডাকাতকে তাহারা কি প্রকারে বিবাহ করিবে। কিন্তু নেশা ছুটিলে সাহেবের মত ফিরিবে, বিবাহ করিতে হইবে না, বিবেচনায় তিন চারিজন সিপাহী গাড়ীর গোরুর দড়ি দিয়া মহেন্দ্রকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া গোরুর গাড়ীতে তুলিল। মহেন্দ্র দেখিলেন, এত লোকের সঙ্গে জোর করা বৃথা, জোর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াই বা কি হইবে? স্ত্রী কন্যার শোকে তখন মহেন্দ্র কাতর, বাঁচিবার কোন ইচ্ছা ছিল না। সিপাহীরা মহেন্দ্রকে উত্তম করিয়া গাড়ীর চাকার সঙ্গে বাঁধিল। পরে সিপাহীরা খাজানা লইয়া যেমন চলিতেছিল, তেমনি মৃদুগন্তীরপদে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ মৃদু মৃদু হরিণাম করিতে করিতে, যে চটীতে মহেন্দ্র বসিয়াছিল, সেই চটীর দিকে চলিলেন। সেইখানেই মহেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বিবেচনা করিলেন।

সে সময়ে ইংরেজের কৃত আধুনিক রাস্তা সকল ছিল না। নগর সকল হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে, মুসলমান সত্ৰাট-নির্মিত অপূর্ব বস্ত্র দিয়া আসিতে হইত। মহেন্দ্রও পদচিহ্ন

হইতে নগর যাইতে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যাইতেছিলেন । এই জন্ত পথে সিপাহীদিগের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । ভবানন্দ তালপাহাড় হইতে যে চটীর দিকে চলিলেন, সেও দক্ষিণ হইতে উত্তর । যাইতে যাইতে কাজে কাজেই অচিরাতঃ ধনরক্ষাকারী সিপাহীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল । তিনিও মহেন্দ্রের গুণ সিপাহীদিগকে পাশ দিলেন । একে সিপাহীদিগের সহজেই বিশ্বাস ছিল, যে এই চালান লুঠ করিবার জন্ত ডাকাইতেরা অবশু চেষ্টা করিবে, তাতে আবার পথিমধ্যে একজন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিয়াছে । কাজে কাজেই ভবানন্দকে আবার রাত্ৰিকালে পাশ দিতে দেখিয়াই তাহাদিগের বিশ্বাস হইল, যে এও আর একজন ডাকাত । অতএব সিপাহীরা তৎক্ষণাতঃ তাঁহাকেও ধৃত করিল ।

ভবানন্দ মৃদু হাসিয়া বলিলেন “কেন বাপু ?”

সিপাহী বলিল, “তোম্ শালা ডাকু হো ।”

ভবা । দেখিতে পাইতেছ, গেরুয়াবসন পরা ব্রহ্মচারী আমি ডাকাত কি এই রকম ।

সিপাহী । অনেক শালা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ডাকাতী করে । এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের গলাধাক্কা দিয়া টানিয়া আনিল । ভবানন্দের চক্ষু সে অন্ধকারে জলিয়া উঠিল । কিন্তু তিনি আর কিছু না বলিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, “প্রভু কি করিতে হইবে আশ্রা করুন ।”

সিপাহী ভবানন্দের বিনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, “লেও শাল মাথে পর একঠো মোট লেও ।” এই বলিয়া সিপাহী ভবানন্দের মাথার উপর একটা তন্নী চাপাইয়া দিল । তখন আর একজন

সিপাহী তাহাকে বলিল, “না ; পলাবে। আর এক শালাকে যেখানে বেঁধে রেখেছ, এ শালাকেও গাড়ীর উপর সেইখানে বেঁধে প্লাং।” ভবানন্দের তখন কোতূহল হইল যে কাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দেখিব। তখন ভবানন্দ মাথার তল্লী ফেলিয়া দিয়া, যে সিপাহী তল্লী মাথায় তুলিয়া দিয়াছিল তাহার গালে এক চড় মারিলেন। সুতরাং সিপাহী ভবানন্দকেও বাঁধিয়া গাড়ীর উপর তুলিয়া মহেন্দ্রের নিকট ফেলিল। ভবানন্দ চিনিলেন যে মহেন্দ্র সিংহ।

সিপাহীরা পুনরায় অন্তমনস্ক কোলাহল করিতে করিতে চলিল, আর গোকুর গাড়ীর চাকার কচকচ শব্দ হইতে লাগিল, তখন ভবানন্দ ধীরে ধীরে কেবল মহেন্দ্র-মাত্র শুনিতে পায় এইরূপ স্বরে বলিলেন, “মহেন্দ্র সিংহ, আমি তোমায় চিনি, তোমার সাহায্যের জন্তই আমি এখানে আসিয়াছি। কে আমি তাহা এখন তোমার শুনবার প্রয়োজন নাই। আমি বাহা বলি সাবধানে তাহা কর। তোমার হাতের বাঁধনটা গাড়ীর চাকার উপর রাখ।”

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনা বাক্যব্যয়ে ভবানন্দের কথামত কাজ করিলেন। অন্ধকারে গাড়ীর চাকার নিকট একটু খানি সরিয়া গিয়া, হস্তবন্ধনরজ্জু চাকায় স্পর্শ করাইয়া রাখিলেন। চাকার ঘর্ষণে ক্রমে দড়িটা কাটিয়া গেল। তার পর পায়ের দড়ি ঐরূপ করিয়া কাটিলেন। এইরূপে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভবানন্দের পরামর্শে নিশ্চেষ্ট হইয়া গাড়ীর উপরে পড়িয়া রহিলেন। ভবানন্দও সেইরূপ করিয়া বন্ধন ছিন্ন করিলেন। উভয়ে নিস্তরক।

যেখানে সেই জঙ্গলের কাছে রাজপথে দাঁড়াইয়া, লেন। চারী চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন সেই পথে ইহা'ইয়া-যাইবার পথ। সেই পাহাড়ের নিকট সিপাহীরা চলিলেন, দেখিল যে পাহাড়ের নীচে একটা টিপির উপর একটি মজ্জই দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রদীপ্ত নীল আকাশে তাহার কালো শরীর চিত্রিত হইয়াছে দেখিয়া, হাওলদার বলিল, “আরও এক শালা ঐ। উহাকে ধরিয়া আন। মোট বহিবে।” তখন একজন সিপাহী তাহাকে ধরিতে গেল। সিপাহী ধরিতে যাইতেছে, সে ব্যক্তি স্থির দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে না। সিপাহী তাহাকে ধরিল, সে কিছু বলিল না। ধরিয়া তাহাকে হাওলদারের নিকট আনিল, তখনও কিছু বলিল না। হাওলদার বলিলেন উহার মাথায় মোট দাও।” সিপাহী তাহার মাথায় মোট দিল, সে মাথায় মোট লইল। তখন হাওলদার পিছন ফিরিয়া, গাড়ীর সঙ্গে চলিল। এই সময়ে হঠাৎ একটি পিস্তলের শব্দ হইল, হাওলদার মস্তকে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল। “এই শালা হাওলদারকে মারা” বলিয়া একজন সিপাহী মুটিয়ার হাত ধরিল। মুটিয়ার হাতে তখনও পিস্তল। মুটিয়া মাথায় মোট ফেলিয়া দিয়া পিস্তল উল্টাইয়া ধরিয়া সেই সিপাহীর মাথায় মারিল, সিপাহীর মাথা ভাঙ্গিয়া গেল, সে নিরস্ত হইল। সেই সময়ে “হরি! হরি! হরি!” শব্দ করিয়া ছুইশত শস্ত্রধারী লোক আনিয়া সিপাহীদিগকে ঘিরিল। সিপাহীরা তখন সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সাহেবও ডাকাত পড়িয়াছে বিবেচনা করিয়া সত্বর গাড়ীর কাছে আসিয়া চতুষ্কোণ করিবার আজ্ঞা দিলেন। ইংরেজের

সিপাহীরা বিপদের সময়ে থাকে না। তখনই সিপাহীরা চারিদিকে যেখানে ফিরিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দাঁড়াইল। অধ্যক্ষের পুনর্বার বেঁধে পাইয়া তাহারা বন্দুক তুলিয়া ধরিল। এমন সময়ে বাঁধি সাহেবের কোমর হইতে তাঁহার অসি কে কাড়িয়া গেল। লইয়াই একাধাতে তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। সাহেব ছিন্নশির হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলে আর তাঁহার ফায়ারের হুকুম দেওয়া হইল না। সকলে দেখিল যে, এক ব্যক্তি গাড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে হরি হরি শব্দ করিতেছে এবং “সিপাহী মার সিপাহী মার,” বলিতেছে। সে ভবানন্দ।

সহসা অধ্যক্ষকে ছিন্নশির দেখিয়া এবং রক্ষার জন্ত কাহারও নিকটে আত্মা না পাইয়া সিপাহীরা কিয়ৎক্ষণ ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইল। এই অবসরে তেজস্বী দস্যুরা তাহাদিগের অনেককে হত ও আহত করিয়া গাড়ীর নিকটে আসিয়া টাকার বাক্সসকল হস্তগত করিল। সিপাহীরা ভগ্নোৎসাহ ও পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইল।

তখন যে ব্যক্তি টিপির উপর দাঁড়াইয়া ছিল, এবং শেষে যুদ্ধের প্রধান নেতৃত্বগ্রহণ করিয়াছিল, সে ভবানন্দের নিকট আসিল। উভয়ে তখন আলিঙ্গন করিলে ভবানন্দ বলিলেন, ‘ভাই জীবানন্দ, সার্থক ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে।’

জীবানন্দ বলিল, “ভবানন্দ ! তোমার নাম সার্থক হউক।” অপরূপ ধন যথাস্থানে লইয়া বাইবার ব্যবস্থা করণে জীবানন্দ নেযুক্ত হইলেন, তাঁহার অনুচরবর্গ সহিত পীত্বই তিনি স্থানান্তরে গেলেন। ভবানন্দ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ।

মহেন্দ্র শকট হইতে নামিয়া একজন সিপাহীর গ্রহণ কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধে যোগ দিবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল যে ইহারা দস্যু ; ধনাপহরণ জন্যই সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধস্থান হইতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন কেন না দস্যুদের সহায়তা করিলে তাহাদিগের ছুরাচারের ভাগী হইতে হইবে। তখন তিনি তরবারি ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ভবানন্দ আসিয়া তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয় আপনি কে ?”

১০২৭২

ভবানন্দ বলিল, “তোমার তাতে প্রয়োজন কি ?”

মহে। আমার কিছু প্রয়োজন আছে। আজ আমি আপনার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

ভবা। সে বোধ যে তোমার আছে এমন বুঝিলাম না— অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে দুধ ঘির শ্রদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান !

ভবানন্দের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে, মহেন্দ্র ঘণার সহিত বলিলেন—“এ যে কুব্জ—ডাকাতি।” ভবানন্দ বলিল, “হউক ডাকাতি, আমরা তোমার কিছু উপকার করিয়াছি। আরও কিছু উপকার করিবার ইচ্ছা রাখি।”

মহেন্দ্র । তোমরা আমার কিছু উপকার করিয়াছ বটে কিন্তু আর কি উপকার করিবে ? আর ডাকাতির কাছে এত উপকৃত হওয়ার চেয়ে আমার অল্পকৃত থাকাই ভাল ।

ভবা । উপকার গ্রহণ কর না কর, তোমারই ইচ্ছা । যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে আইস । তোমার স্ত্রী কস্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব ।

মহেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল । বলিল, “সে কি ?”

ভবানন্দ সে কথার উত্তর না করিয়া চলিল । অগত্যা মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চলিল—মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এরা কি রকম দস্যু ?

দশম পরিচ্ছেদ ।

সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দুইজনে নীরবে প্রান্তর পার হইয়া চলিল । মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্ষিত, কিছু কৌতূহলী ।

ভবানন্দ সহসা ভিন্নমূর্তি ধারণ করিলেন । সে স্থিরমূর্তি, ধীর প্রকৃতি সন্ন্যাসী আর নাই ; সেই রণনিপুণ বীরমূর্তি—সৈন্য্য-।
 ধাক্কের মুণ্ডঘাতীর মূর্তি আর নাই । এখনই যে গর্ষিতভাবে মহেন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছিলেন, সে মূর্তি আর নাই । যেন

জ্যোৎস্নাময়ী, শান্তি-শালিনী, পৃথিবীর প্রান্তর-কানন-নগ-
নদীময় শোভা দেখিয়া তাঁহার চিত্তের বিশেষ ক্ষুধা হইল—
সমুদ্র যেন চন্দ্রোদয়ে হাসিল। ভবানন্দ হাস্তমুখ, বাস্বয়,
প্রিয়সম্ভাষী হইলেন। কথাবার্তার জগৎ বড় ব্যগ্র। ভবানন্দ
কথোপকথনের অনেক উদ্যম করিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র কথা
কহিল না। তখন ভবানন্দ নিরুপায় হইয়া আপন মনে গীত
আরম্ভ করিলেন,—

“বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং

মলয়জশীতলাং

শস্যশ্যামলাং

মাতরম্ ।”

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল
না—সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে,—
ছিজ্ঞাসা করিল “মাতা কে ?”

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গায়িতে লাগিলেন ।

“শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—

ফুল্ল-কুসুমিত-ক্রমদলশোভিনীম্

সুহাসিনীম্ সুমধুরভাষিণীম্

সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।”

মহেন্দ্র বলিল, “এ ত দেশ, এ ত মা নয়—”

• ১ x ১

*মন্ত্র—কাওয়ালী তাল যথা—বন্দে মাতরম্ ইত্যাদি ।

ভবানন্দ বলিলেন, “আমরা অন্ত মা মামি না—জননী
জন্মভূমিষ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী । আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী,
আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—স্ত্রী নাই,
পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই
সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা,—”

তখন বৃষ্টিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, “তবে আবার গাও ।”

ভবানন্দ আবার গায়িলেন ;—

“বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং

মলয়জশীতলাং

শস্যশ্যামলাং

মাতরম্ ।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্

ফুল্লকুসুমিত-ক্রমদলশোভিনীম্

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্

সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

স পুঙ্কোটীকণ্ঠকলকলনিদাদকরালে,

দ্বিস পুঙ্কোটীভূজৈধ্বতপর-করবালে,

অবলা কেন মা এত বলে ।

বহুবলধারিণীং

নমামি তারিণীং

ত্রিপুন্দলবারিণীং

মাতরম্ ।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম

তুমি হৃদি তুমি মন্ত্র

তুংহি প্রাণাঃ শরীরে ।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
 হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
 তোমারই প্রতিমা গড়ি
 মন্দিরে মন্দিরে ।
 তুংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
 কমলা কমল-দলবিহারিণী
 বাণী বিদ্যাদায়িনী
 নমামি ত্বাং
 নমামি কমলাম্
 অমলাং অতুলাম্
 সূক্তলাং সূফলাম্
 মাতরম্
 বন্দে মাতরম্
 শ্যামলাং সরলাং
 স্মৃশ্বিতাং ভূষিতাম্
 ধরণীং ভরণীম
 মাতরম্”

মহেন্দ্র দেখিল, দস্যু গায়িতে গায়িতে কাঁদিতে লাগিল ।
 মহেন্দ্র, তখন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল “তোমরা কারা ?”
 ভবানন্দ বলিল, “আমরা সন্তান ।”

মহেন্দ্র । সন্তান কি ? কার সন্তান ?

ভবা । মায়ের সন্তান ।

মহেন্দ্র । ভাল—সন্তানে কি চুরি ডাকাতি করিয়া মায়ের
 পূজা করে ? সে কেমন মাতৃভক্তি ?

ভবা । আমরা চুরি ডাকাতি করি না ।

মহে। এই ত গাড়ি লুঠিলে।

ভবা। সে কি চুরি ডাকাতি? কার টাকা লুঠিলাম?

মহে। কেন? রাজার।

ভবা। রাজার? এই যে টাকাগুলি সে লইবে এ টাকায়
তার কি অধিকার?

মহে। রাজার রাজভাগ।

ভবা। যে রাজা রাজ্য পালন করে না, সে আবার রাজা
কি?

মহে। তোমরা সিপাহীর তোপের মুখে কোন দিন উড়িয়া
যাইবে দেখিতেছি।

ভবা। অনেক শালা সিপাহী দেখিয়াছি—আজিও দেখিলাম।

মহে। ভাল করে দেখনি, একদিন দেখিবে।

ভবা। না হয় দেখলাম, একবার বই ত ছবার মরব না।

মহে। তা ইচ্ছা করিয়া মরিয়া কাজ কি?

ভবা। মহেন্দ্র সিংহ তোমাকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া
আমার কিছু বোধ ছিল, কিন্তু এখন দেখিলাম, সবাই যা তুমিও
তা। কেবল দুধ ঘির যম। দেখ সাপ মাটিতে বুক দিয়া
হাঁটে, তাহা অপেক্ষা নীচ জীব আমি ত আর দেখি না; সাপের
ঘাড়ে পা দিলে সেও ফণা ধরিয়া উঠে। তোমার কি কিছুতেই
ধৈর্য্য নষ্ট হয় না? দেখ যত দেশ আছে,—মগধ, মিথিলা,
কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, কাশ্মীর, কোন্ দেশের এমন হৃদশা,
কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়? কাঁটা খায়?
উইমাটী খায়? বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ
শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্ধুকে

টাকা রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঝি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে শোয়াস্তি নাই? পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশে রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়। এ নেশাখোর দেড়ের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানী থাকে।

মহে। তাড়াবে কেমন করে?

ভবা। মেরে।

মহে। তুমি একা তাড়াবে? এক চড়ে নাকি?

দম্ভ্য গায়িল :—

“সপ্তকোটীকঠ-কলকল-নিদাদকরালে।

দ্বিসপ্তকোটীভুজৈধৃতখরকরবালে

অবলা কেন মা এত বলে।”

মহে। কিন্তু দেখিতেছি তুমি একা?

ভবা। কেন এখনি ত দশ লোক দেখিয়াছ।

মহে। তাহারা কি সকলে সন্তান?

ভবা। সকলেই সন্তান।

মহে। আর কত আছে?

ভবা। এমন হাজার হাজার, ক্রমে আরও হবে।

মহে। না হয় দশ বিশ হাজার হল, তাতে কি মুসলমানকে রাজ্যচ্যুত করিতে পারিবে?

ভবা। পলাশীতে ইংরেজের ক জন ফৌজ ছিল?

মহে । ইংরেজ আর বাঙ্গালীতে ?

ভবা । নয় কিসে ? গায়ের জোরে কত হয়—গায়ে জিয়াদা জোর থাকিলে গোলা কি জিয়াদা ছোটো ?

মহে । তবে ইংরেজ মুসলমানে এত তফাত কেন ?

ভবা । ধর, এক ইংরেজ প্রাণ গেলেও পলায় না, মুসলমান গা ঘামিলে পলায়—শরবত খুঁজিয়া বেড়ায়—ধর তার পর, ইংরেজের জিদ আছে—যা ধরে তা করে, মুসলমানের এলাকাড়ি । টাকার জন্ত প্রাণ দেওয়া, তাও সিপাহীরা মাহিয়ানা পায় না । তার পর শেষ কথা সাহস—কামানের গোলা এক জায়গায় বই দশ জায়গায় পড়বে না—সুতরাং একটা গোলা দেখে দুশ জন পলাইবার দরকার নাই । কিন্তু একটা গোলা দেখিলে মুসলমানের গোষ্ঠীশুদ্ধ পলায়—আর গোষ্ঠীশুদ্ধ গোলা দেখিলে ত একটা ইংরেজ পলায় না ।

মহে । তোমাদের এ সব গুণ আছে ?

ভবা । না । কিন্তু গুণ গাছ থেকে পড়ে না । অভ্যাস করিতে হয় ।

মহে । তোমরা কি অভ্যাস কর ?

ভবা । দেখিতেছ না আমরা সন্ন্যাসী ? আমাদের সন্ন্যাস এই অভ্যাসের জন্ত । কার্য উদ্ধার হইলে—অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে—আমরা আবার গৃহী হইব । আমাদেরও স্ত্রী কন্যা আছে ।

মহে । তোমরা সে সকল ত্যাগ করিয়াছ—মায়া কাটাইতে পারিয়াছ ?

ভবা । সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই—তোমার কাছে

মিথ্যা বড়াই করিব না। মায়া কাটাইতে পারে কে ? যে বলে আমি মায়া কাটাইয়াছি, হয় তার মায়া কখন ছিল না, বা সে মিছা বড়াই করে। আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি। তুমি সন্তান হইবে ?

মহে। আমার স্ত্রীকন্যার সংবাদ না পাইলে আমি কিছু বলিতে পারি না।

ভবা। চল, তবে তোমার স্ত্রীকন্যাকে দেখিবে চল।

এই বলিয়া দুইজনে চলিল ; ভবানন্দ আবার “বন্দে মাতরম্” গায়িতে লাগিল। মহেন্দ্রের গলা ভাল ছিল, সঙ্গীতে একটু বিদ্যা ও অনুরাগ ছিল—সুতরাং সঙ্গ গায়িল—দেখিল যে গায়িতে গায়িতে চক্ষে জল আইসে। তখন মহেন্দ্র বলিল,

“যদি স্ত্রীকন্যা ত্যাগ না করিতে হয় তবে এ ব্রত আমাকে গ্রহণ করাও।”

ভবা। এ ব্রত যে গ্রহণ করে সে স্ত্রীকন্যা পরিত্যাগ করে। তুমি যদি এ ব্রত গ্রহণ কর, তবে স্ত্রী কন্যার সঙ্গ সাক্ষাৎ করা হইবে না। তাহাদিগের রক্ষা হেতু উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা যাইবে, কিন্তু ব্রতের সফলতা পর্য্যন্ত তাহাদিগের মুখদর্শন নিষেধ।

মহেন্দ্র। আমি এ ব্রত গ্রহণ করিব না।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে । সেই জনহীন কানন,—এতক্ষণ অন্ধকার, শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময়—পক্ষিকুজনশব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল । সেই আনন্দময় প্রভাতে, আনন্দময় কাননে, “আনন্দমঠে,” সত্যানন্দ ঠাকুর হরিগচর্ম্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন । কাছে বসিয়া জীবানন্দ । এমন সময়ে ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল । ব্রহ্মচারী বিনাবাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না । পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক বিনীত ভাবে উপবেশন করিলেন । তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন । কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না । তাহার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সক্রম সহাস্র বদনে মহেন্দ্রকে বলিলেন, “বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর রূপায় তোমার স্ত্রী কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম ।” এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন । তার পর বলিলেন যে, “চল তাহারা যেখানে আছে তোমাকে সেখানে লইয়া যাই ।”

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবা-

লয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ । এই নবাক্ষয়প্রফুল্ল প্রাতঃকালে, যখন নিকটস্থ কানন সূর্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার । ঘরের ভিতরে কি আছে মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না— দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে, ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজমূর্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তভশোভিত হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত । মধুকৈটভ স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে । বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালা-মণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন । দক্ষিণে সরস্বতী, পুস্তক, বাণ্যন্ত্র, মূর্তিমান্ রাগ রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন । বিষ্ণুর অক্ষোপরি এক মোহিনী মূর্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যাবিতা । গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে । ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সকল দেখিতে পাইতেছ ?” মহেন্দ্র বলিল, “পাইতেছি ।”

ব্রহ্ম । বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ ?

মহে । দেখিয়াছি । কে উনি ?

ব্রহ্ম । মা ।

মহে । মা কে ?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “আমরা যার সন্তান ।”

মহেন্দ্র । কে তিনি ?

ব্রহ্ম । সময়ে চিনিবে । বল—বন্দে মাতরম্ । এখন চল, দেখিবে চল ।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষাস্তরে লইয়া গেলেন । সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্ন সর্বাঙ্গভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি । মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি কে ?”

ব্র । মা—যা ছিলেন ।

ম । সে কি ?

ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু সকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাস স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন । ইনি সর্কালঙ্কারপরিভূষিতা হাশুময়ী সুন্দরী ছিলেন । ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্যশালিনী । ইহঁাকে প্রণাম কর ।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, “এই পথে আইস ।” ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন । মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন । ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছিল । সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্তি দেখিতে পাইলেন ।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,

“দেখ মা যা হইয়াছেন ।”

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, “কালী ।”

ব্র । কালী—অন্ধকারনমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী । হৃতসর্কস্ব, এইজন্য নগ্নিকা । আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কাল-মালিনী । আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা !

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র
জিজ্ঞাসা করিলেন—“হাতে খেটক খর্পর কেন?”

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—
বল বন্দে মাতরম্।

“বন্দে মাতরম্” বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিলেন।
তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, “এই পথে আইস।” এই বলিয়া
তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা
তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল।
চারিদিক হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন
এক মর্ম্মরপ্রস্তুতনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সূবর্ণনির্ম্মিতা
দশভূজা প্রতিমা নবাকর্ণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে।
ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

“এই মা যা হইবেন। দশভূজ দশদিকে প্রসারিত,—
তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে
শক্রবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শক্রনিপীড়নে নিযুক্ত।
দিগ্ভূজা”—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদগদকণ্ঠে কাঁদিতে
লাগিলেন। “দিগ্ভূজা—নানাপ্রহরণধারিণী শক্রবিমর্দ্দিনী—
বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী
বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধরূপী
গণেশ; এস আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।” তখন
তুই জনে যুক্তকরে উদ্ধমুখে এককণ্ঠে ডাকিতে লাগিল,

“সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গলো শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে !

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ত তে।”

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোথান করিতে

মহেন্দ্র গলাদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব ?”

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে । সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন ।”

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার স্ত্রী কত্না কোথায় ?”

ব্রহ্ম । চল—দেখিবে চল ।

মহেন্দ্র । তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব ।

ব্রহ্ম । কেন বিদায় দিবে ?

ম । আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব ।

ব্রহ্ম । ^{কণ্ঠ} কাথায় বিদায় দিবে ?

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ ^{মরন্ত} মরন্তা করিয়া কহিলেন, “আমার গৃহে কেহ নাই, আমার ^{মর} উ স্থানও নাই । এ মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থা ^{ধে} দিইব ।”

ব্রহ্ম । যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও । মন্দির-দ্বারে তোমার স্ত্রী কত্নাকে দেখিতে পাইবে । কল্যাণী এ পর্য্যন্ত অভুক্তা । যেখানে তাহারা বসিয়া আছে, সেইখানে ভক্ষ্যসামগ্রী পাইবে । তাহাকে ভোজন করাইয়া তোমার যাহা অভিরুচি তাহা করিও, এক্ষণে আমাদিগের আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইবে না । তোমার মন যদি এইরূপ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে, তোমাকে দেখা দিব ।

তখন অকস্মাৎ কোন পথে ব্রহ্মচারী অন্তর্হিত হইলেন ।

মহেন্দ্র পূর্বপ্রদৃষ্ট পথে নির্গমনপূর্বক দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কণ্ঠা লইয়া বসিয়া আছে।

এদিকে সত্যানন্দ অত্র সুরঙ্গ দিয়া অবতরণপূর্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষায় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছে। সেই ঘরে স্তূপে স্তূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, প্রবাল, মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে। গতরাত্রে লুঠের টাকা, ইহারা সাজাইয়া রাখিতেছে। সত্যানন্দ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে। কেন না তাহা হইলে উহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মার সেবায় অর্পিত হইবে। কিন্তু যতদিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমা-দিগের হাতের কাজ সমাপ্ত হইলে তোদের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার অনুসরণ করিও, সময় দেখিলে তুমি হাকে শ্রীবিক্ষুণ্ণমণ্ডপে উপস্থিত করিও। আর সময়ে হউক অসময়ে হউক, উহাদিগের প্রাণরক্ষা করিও। কেন না যেমন ছুষ্ঠের শাসন সন্তানের ধর্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

অনেক ছুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল । কল্যাণী কাঁদিয়া লুটিয়া পড়িল । মহেন্দ্র আরও কাঁদিল । কাঁদা কাটার পর চোখ মুছার ধুম পড়িয়া গেল । যতবার চোখ মুছা যায়, ততবার আবার জল পড়ে । জলপড়া বন্ধ করিবার জন্ত কল্যাণী খাবার কথা পাড়িল । ব্রহ্মচারীর অনুচর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছে, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে বলিল । দুর্ভিক্ষের দিন অন্ন ব্যঞ্জন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দেশে যাহা আছে সম্ভানের কাছে তাহা সুলভ । সেই কানন সাধারণ মনুষ্যের অগম্য । যেখানে যে গাছে, যে ফল হয়, উপবাসী মনুষ্যগণ তাহা পাড়িয়া খায় । কিন্তু এই অগম্য অরণ্যের গাছের ফল আর কেহ পায় না । এইজন্ত ব্রহ্মচারীর অনুচর বহুতর বস্ত্রফল ও কিছু দুগ্ধ আনিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিল । সন্ন্যাসীঠাকুরদের সম্পত্তির মধ্যে অনেকগুলি গাই ছিল । কল্যাণীর অনুরোধে মহেন্দ্র প্রথমে কিছু ভোজন করিলেন । তাহার পর ভুক্তাবশেষ কল্যাণী বিরলে বসিয়া কিছু খাইল । দুগ্ধ কত্নাকে কিছু খাওয়াইল, কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিল, আবার খাওয়াইবে । তার পর নিদ্রায় উভয়ে পীড়িত হইলে, উভয়ে শ্রমদূর করিলেন । পরে নিদ্রাভঙ্গের পর উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই । কল্যাণী বলিল, “বাড়ীতে বিপদ বিবেচনা

করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা বাহিরে বিপদ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই।” মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া কোন প্রকারে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতায়ুক্ত মাতৃসেবাব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুইজন গতক্রম হইয়া কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু পদচিহ্নে কোন্ পথে যাইতে হইবে, সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বন হইতে বাহির হইতে পারিলেই পথ পাইবেন। কিন্তু বন হইতে ত বাহির হইবার পথ পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মঠেই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, নির্গমের পথ পাওয়া যায় না। সম্মুখে একজন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত স্বাক্ষচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া মহেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “গোঁসাই হাস কেন?”

গোঁসাই বলিল, “তোমরা এ বনে প্রবেশ করিলে কি প্রকারে?”

মহেন্দ্র। যে প্রকারে হউক প্রবেশ করিয়াছি।

গোঁসাই। প্রবেশ করিয়াছ ত বাহির হইতে পারিতেছ না কেন? এই বলিয়া বৈষ্ণব আবার হাসিতে লাগিল।

রুষ্ট হইয়া মহেন্দ্র বলিলেন, “তুমি হাসিতেছ, তুমি বাহির হইতে পার?”

বৈষ্ণব বলিল, “আমার সঙ্গে আইস, আমি পথ দেখাইয়া দিতেছি। তোমরা অবশ্য কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। নচেৎ এ মঠে আসিবার বা বাহির হইবার পথ আর কেহই জানে না।”

শুনিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, “আপনি সন্তান?”

বৈষ্ণব বলিল, “হাঁ আমিও সন্তান, আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।”

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম কি?”

বৈষ্ণব বলিল, “আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।”

এই, বলিয়া ধীরানন্দ অগ্রে অগ্রে চলিল; মহেন্দ্র, কল্যাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ধীরানন্দ অতি দুর্গম পথ দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া একা বনমধ্যে পুনঃ-প্রবেশ করিল।

অনন্দারণ্য হইতে তাঁহারা বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সবৃক্ষপ্রান্তর আরম্ভ হইল। প্রান্তর একদিকে রহিল, বনের ধারে ধারে রাজপথ। একস্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মত কালো। দুই পাশে শ্রামল শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানা জাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব—সেও মধুর—মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। কল্যাণীর মনও বুঝি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে

বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। স্বামী বসিলেন, কল্যাণী স্বামীর কোল হইতে কন্যাকে কোলে লইলেন। স্বামীর হাত হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাকে আজি আমি বড় বিমর্ষ দেখিতেছি? বিপদ যাহা তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি—এখন এত বিষাদ কেন?”

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—“আমি আর আপনার নহি—আমি কি করিব বুঝিতে পারি না।”

ক। কেন?

মহেী তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা যাহা ঘটয়াছিল শুন। এই বলিয়া যাহা যাহা ঘটয়াছিল মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিলেন,

কল্যাণী বলিলেন, “আমারও অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ গিয়াছে। তুমি শুনিয়া আর কি করিবে? অতিশয় বিপদেও আমার কেমন করে ঘুম আসিয়াছিল বলিতে পারি না—কিন্তু আমি কাল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম—কি পুণ্যবলে বলিতে পারি না—আমি এক অপূর্বস্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটি নাই। কেবল আলো, অতি শীতল মেঘভাঙ্গা আলোর মত বড় মধুর আলো। সেখানে মনুষ্য নাই, কেবল আলোময় মূর্তি, সেখানে শব্দ নাই, কেবল অতিদূরে যেন কি মধুর গীতবাদ্য হইতেছে এমনি একটা শব্দ। সর্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজের গন্ধ। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয়স্থানে কে বসিয়া আছেন,

যেন নীল পর্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে । অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায় । তাঁর যেন চারি হাত । তাঁর দুই দিকে কি আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধ হয় স্ত্রীমূর্তি, কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ, যে আমি সে দিকে চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম ; চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে কে । যেন সেই চতুর্ভূজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রী মূর্তি । সেও জ্যোতির্ময়ী ; কিন্তু চারিদিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অতি শীর্ণা কিন্তু অতি রূপবতী মন্মপীড়িতা কোন স্ত্রী মূর্তি কাঁদিতেছে । আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন বহিয়া বহিয়া, চেউ দিতে দিতে, সেই চতুর্ভূজের সিংহাসন তলে আনিয়া ফেলিল । যেন সেই মেঘমণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইয়া বলিল, ‘এই সে—ইহারই জন্ত মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না ।’ তখন যেন এক অতি পরিষ্কার সুমধুর বাঁশীর শব্দের মত হইল । সেই চতুর্ভূজ যেন আমাকে বলিলেন, ‘তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস । এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে । তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না ; তুমি চলিয়া আইস ।’ —আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, ‘স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে ।’ তখন আবার বাঁশীর শব্দ শব্দ হইল ‘আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস ।’ আমি কি বলিলাম মনে নাই । আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ।” এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া গহিলেন ।

মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোঁকিল দিঙ্‌মঙল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। “ভৃঙ্গরাজ” কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃৎ কল্লোল করিতেছিল। বায়ু বনুপুষ্পের মৃৎ গন্ধ আনিয়া দিতেছিল। কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রোদ্‌র ঝিকিমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃৎ পবনে মন্মথর শব্দ করিতেছিল। দূরে নীল পর্কতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। দুই জনে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন “কি ভাবিতেছ ?”

মহেন্দ্র । কি কারব তাহাই ভাবি—স্বপ্ন কেবল বিভীষিকা-মাত্র, আপনার মনে জন্মিয়া আপনি লয় পায়, জীবনের জলবিন্দু—চল গৃহে যাই।

ক। যেখানে দেবতা, তোমাকে যাইতে বলেন তুমি সেইখানে যাও—এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন।

মহেন্দ্র কন্যা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “আর তুমি—তুমি কোথায় যাইবে?”

কল্যাণী দুই হাতে দুই চোক ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিলেন, “আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন আমিও সেইখানে যাইব।”

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “সে কোথা, কি প্রকারে যাইবে?”

কল্যাণী বিষের কোটা দেখাইলেন ।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “সে কি ? বিষ খাইবে ?”

ক । “খাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু—” কল্যাণী নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । মহেন্দ্র তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিলেন । প্রতিপলকে বৎসর বোধ হইতে লাগিল । কল্যাণী আর কথা শেষ করিলেন না দেখিয়া মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কিন্তু বলিয়া কি বলিতেছিলে ?”

ক । খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া—বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না । আমি মরিব না ।

এই কথা বলিয়া কল্যাণী বিষের কোটা মাটিতে রাখিলেন । তখন দুই জনে ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন । কথায় কথায় উভয়েই অন্তমনস্ক হইলেন । এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কোটা তুলিয়া লইল । কেহই তাহা দেখিলেন না ।

সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিস । কোটাটি একবার বাঁ হাতে ধরিয়া দাহিন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল, তার পর ডাহিন হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে তাহাকে চাপড়াইল । তার পর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল । সুতরাং কোটাটি খুলিয়া গেল—বড়িটা পড়িয়া গেল ।

বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা দেখিল । মনে করিল এও আর একটা খেলিবার

জিনিস। কোঁটা ফেলিয়া দিয়া খাবা মারিয়া বড়িটি তুলিয়া লইল।

কোঁটাটি স্কুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়িটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্তি মাত্রের ভোক্তব্য—স্কুমারী বড়িটি মুখে পুরিল। সেই সময়ে তাহার উপর মার নজর পড়িল।

“কি খাইল! কি খাইল! সর্বনাশ!” কল্যাণী ইহা বলিয়া, কণ্ঠার মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিলেন। তখন উভয়েই দেখিলেন যে বিষের কোঁটা খালি পড়িয়া আছে। স্কুমারী তখন আর একটা খেলা পাইয়াছি মনে করিয়া দাঁত চাপিয়া—সবে গুটিকত দাঁত উঠিয়াছে—মার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বোধ হয় বিষবড়ির স্বাদ মুখে কদর্য লাগিয়াছিল, কেন না কিছু পরে মেয়ে আপনি দাঁত ছাড়িয়া দিল, কল্যাণী বড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতে লাগিল।

বটিকা মাটিতে পড়িয়া রহিল। কল্যাণী নদী হইতে অঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিলেন। অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একটু কি পেটে গেছে?”

মন্দটাই আগে বাপ মার মনে আসে—যেখানে অধিক ভালবাসা সেখানে ভয়ই অধিক প্রবল। মহেন্দ্র কখন দেখেন নাই যে বড়িটা আগে কত বড় ছিল। এখন বড়িটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন “বোধ হয় অনেকটা খাইয়াছে।”

কল্যাণীরও কাজেই সেই বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনিও বড়ি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন। এদিকে, মেয়ে

যে ছুই এক ঢোক গিলিয়াছিল, তাহারই গুণে কিছু বিকৃতাবস্থা
প্রাপ্ত হইল। কিছু ছটফট করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল
—শেষ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে
বলিলেন “আর দেখ কি ? যে পথে দেবতার ডাকিয়াছে,
সেই পথে স্কুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।”

এই বলিয়া কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্ত-
মধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, “কি করিলে—কল্যাণী
ও কি করিলে।”

কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে
প্রহণ করিলেন, বলিলেন, “প্রভু কথা কহিলে কথা বাড়িবে,
আমি চলিলাম।”

“কল্যাণী কি করিলে” বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া
কাঁদিতে লাগিলেন। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগি-
লেন, “আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্ত পাছে
তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর ! দেখ আমি দেববাক্য লঙ্ঘন
করিতেছিলাম তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা
করিলে পাছে তুমিও যাও ?”

মহেন্দ্র কাঁদিয়া বলিলেন, “তোমায় কোথাও রাখিয়া
আসিতাম—আমাদের কাজ সিদ্ধ হইলে আবার তোমাকে
লইয়া সুখী হইতাম। কল্যাণী, আমার সব ! কেন তুমি এমন
কাজ করিলে ! যে হাতের জোরে আমি তরবারি ধরিতাম
সেই হাতই ত কাটিলে ! তুমি ছাড়া আমি কি !”

কল্যাণী। কোথায় আমার লইয়া যাইতে—স্থান কোথায়

আছে ? মা, বাপ, বন্ধুবর্গ এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি ত মরি-
 য়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে,
 কোথায় লইয়া যাইবে ? আমি তোমার গলগ্রহ। আমি
 মরিলাম ভালই করিলাম। আমায় আশীর্বাদ কর, যেন আমি
 সেই—সেই আলোময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা
 পাই।” এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ
 করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোন উত্তর না করিতে পারিয়া
 আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কল্যাণী আবার বলিলেন,—
 অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি স্নেহময় কণ্ঠ—আবার বলিলেন ;
 “দেখ, দেবতার ইচ্ছা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে। আমায়
 দেবতার ষাইতে আঞ্জা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি
 থাকিতে পারি—আপনি না মরিতাম ত অবশ্য আর কেহ
 মারিত। আমি মরিয়া ভালই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ
 করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে।
 আমার তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুইজন একত্রে অনন্ত
 স্বর্গভোগ করিব।”

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল—
 তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক
 নহে। কিন্তু সে সময় সে দিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না।
 তিনি কণ্ঠকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন
 করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য
 হইতে মৃদু অথচ মেঘগন্তীর শব্দ শুনা গেল।

“হরে মুরাষে মধুকৈটভারে !

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে !”

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু
অপহৃত হইতেছিল, তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই
বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূৰ্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে :—

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে !

গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সোরে !”

তখন কল্যাণী অঙ্গরোনিন্দিত কণ্ঠে মোহভরে ডাকিতে
লাগিলেন,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

মহেন্দ্রকে বলিলেন, “বল,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

কানননির্গত মধুর স্বর আর কল্যাণীর মধুরস্বরে বিমুগ্ধ
হইয়া কাতরচিত্তে ঈশ্বর মাত্র সহায় মনে করিয়া মহেন্দ্রও
ডাকিলেন,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

তখন চারিদিক্ হইতে ধ্বনি হইতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

তখন যেন গাছের পাখীরাও বলিতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

নদীর কলকলেও যেন শব্দ হইতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

তখন মহেন্দ্র শোকতাপ ভুলিয়া গেলেন—উন্মত্ত হইয়া
কল্যাণীর সহিত একতানে ডাকিতে লাগিলেন,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

কানন হইতেও যেন তাঁহাদের সঙ্গে একতানে শব্দ হইতে
লাগিল,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষাণ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু ডাকিতেছেন,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

তখন ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তরু হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষুঃ নিমীলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল, মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী “হরে মুরারে” ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। তখন পাগলের আয় উঠেঃ-স্বরে কানন বিকম্পিত করিয়া, পশুপক্ষীগণকে চমকিত করিয়া মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

সেই সময়ে কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সঙ্গে তেমনি উঠেঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,

“হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।”

তখন সেই অনন্তের মহিমায়, সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে, অনন্তপথগামিনীর শরীরসম্মুখে দুইজনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশু পক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূৰ্ণ শোভা-ময়ী—এই চরমগতির উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

এদিকে রাজধানীতে রাজপথে বড় ছলম্বুল পড়িয়া গেল । রব উঠিল যে রাজসরকার হইতে কলিকাতায় যে খাজনা চালান যাইতেছিল, সন্ন্যাসীরা তাহা মারিয়া লইয়াছে । তখন রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসী ধরিতে সিপাহী বরকন্দাজ ছুটীতে লাগিল । এখন সেই দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশে সে সময়ে প্রকৃত সন্ন্যাসী বড় ছিল না । কেন না তাহারা ভিক্ষোপজীবী ; লোকে আপনি খাইতে পায় না, সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিবে কে ? অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসী যাহারা তাহারা সকলেই পেটের দায়ে কাশী, প্রয়াগাদি অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল । কেবল সন্তানেরা ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিত, প্রয়োজন হইলে পরিত্যাগ করিত । আজ গোলযোগ দেখিয়া অনেকেই সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করিল । এজন্ত বুদ্ধু রাজানুচরবর্গ কোথাও সন্ন্যাসী না পাইয়া কেবল গৃহস্থদিগের হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গিয়া উদর অর্ধপূরণপূর্বক প্রতিনিবৃত্ত হইল । কেবল সত্যানন্দ কোন কালে গৈরিকবসন পরিত্যাগ করিতেন না ।

সেই কৃষ্ণ কল্লোলিনী ক্ষুদ্র নদীতীরে সেই পথের ধারেই বৃক্ষতলে নদীতটে কল্যাণী পড়িয়া আছে, মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া সাক্ষরলোচনে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, নজরদারী জমাদার সিপাহী লইয়া, এমন সময়ে সেইখানে উপস্থিত । একেবারে সত্যানন্দের গলদেশে হস্তার্ঘ্যপূর্বক বলিল, "এই শালা সন্ন্যাসী ।" আর একজন অমনি মহেন্দ্রকে ধরিল — কেন না, যে সন্ন্যাসীর সঙ্গী সে অবশ্য সন্ন্যাসী হইবে :

আর একজন শম্পোপরি লক্ষ্যমান কল্যাণীর মৃতদেহটাও ধরিতে যাইতেছিল। কিন্তু দেখিল যে, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, সন্ন্যাসী না হইলেও হইতে পারে। আর ধরিল না। বালিকাকেও ঐরূপ বিবেচনার ত্যাগ করিল। পরে তাহার কোন কথাবার্তা না বলিয়া দুই জনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকা কণ্ঠা বিনারক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্নত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কি হইতেছিল, কি হইল বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই চারিপদ গেলে বুঝিলেন যে, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল, সংকা হইল না, শিশুকন্যা পড়িয়া রহিল, এইক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্র জন্তু খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুইটি হাত পরস্পর হইতে বলে বিশ্লিষ্ট করিলেন, একটাকে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে এক পদাঘাতে জমাদা সাহেবকে ভূমিশয়া অবলম্বন করাইয়া একজন সিপাহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন। তখন অপর তিনজন তাঁহাকে তিন দিক্ হইতে ধরিয়া পুনর্বার বিজিত ও নিশ্চেষ্ট করিল। তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে “আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচজন দুরাগ্নাবে বধ করিতে পারিতাম।” সত্যানন্দ বলিলেন, “আমরা এই প্রাচীন শরীরে বল কি—আমি যাহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই—তুমি, যাহা অবশ্য ঘটবে

তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। আমরা এই পাঁচজনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।” তখন তাঁহারা দুই জনে আর কোন মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপু আমি হরি নাম করিয়া থাকি— হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?” সত্যানন্দকে ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল, সে বলিল, “তুমি হরিনাম কর, তোমার বারণ করিব না। তুমি বুড়া ব্রহ্মচারী, বোধ হয় তোমার খালাসের ছকুমই হইবে, এই বদমাস ফাসি যাইবে।” তখন ব্রহ্মচারী, মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন :—

ধীরসমীরে,

তটিনীতীরে

বসতি বনে বরনারী ।

মাকুর ধমুর্ধর,

গমনবিলম্বন

অতি বিধুরা শুকুমারী ॥

ইত্যাদি ।

নগরে পৌঁছিলে তাঁহারা কোতয়ালের নিকট নীত হইলেন। কোতয়াল রাজসরকারে এতলা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেঞ্জকে সম্প্রতি ফাটকে রাখিলেন। সে কারার অতি ভয়ঙ্কর, যে যাইত, সে প্রায় বাহির হইত না, কন না বিচার করিবার লোক ছিল না। ইংরেজের জেল য—তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন— এখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে গনা কর ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি উপস্থিত। কারাগার মধ্যে বদ্ধ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, “আজ অতি আনন্দের দিন। কেন না আমরা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি। বল হরে মুরারে!” মহেন্দ্র কাতর স্বরে বলিলেন, “হরে মুরারে!”

সত্য। কাতর কেন বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করিলে এ স্ত্রী কন্যা ত অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর ত কোন সম্বন্ধ থাকিত না।

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম, সে শক্তি আমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হইবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, “আমার স্ত্রী কন্যাবে শৃগালে কুকুরে খাইতেছে—আমাকে কোন ব্রতের কথা বলিবেন না।”

সত্য। সে বিষয়ে নিশ্চিত থাক। সম্মানগণ তোমার স্ত্রীর সংকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, বড় বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন “আপনি কি প্রকারে জানিলেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।”

সত্য । আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত । দেবতা আমা-
দিগের প্রতি দয়া করেন । আজি রাত্রেই তুমি এ সংবাদ
পাইবে, আজি রাত্রেই তুমি কারাগার হইতে মুক্ত হইবে ।

মহেন্দ্র কোন কথা কহিলেন না । সত্যানন্দ বুঝিলেন,
যে মহেন্দ্র বিশ্বাস করিতেছেন না । তখন সত্যানন্দ বলিলেন,
“বিশ্বাস করিতেছ না—পরীক্ষা করিয়া দেখ ।” এই বলিয়া
সত্যানন্দ কারাগারের দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন । কি করিলেন,
অন্ধকারে মহেন্দ্র কিছু দেখিতে পাইলেন না । কিন্তু কাহারও
সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহা বুঝিলেন । ফিরিয়া আসিলে, মহেন্দ্র
জিজ্ঞাসা করিলেন “কি পরীক্ষা ?”

সত্য । তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিবে ।
এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল
এক ব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল,

“মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম ?”

মহেন্দ্র বলিলেন, “আমার নাম ।”

আগন্তুক বলিল, “তোমার খালাসের হুকুম হইয়াছে—
যাইতে পার ।”

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইলেন—পরে মনে করিলেন মিথ্যা
কথা । পরীক্ষার্থ বাহির হইলেন । কেহ তাঁহার গতিরোধ
করিল না । মহেন্দ্র রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন ।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিল, “মহারাজ !
আপনিও কেন যান না ? আমি আপনারই জন্ত আসিয়াছি ।”

সত্য । তুমি কে ? ধীরানন্দ গৌসাই ?

ধীর । আজ্ঞে হাঁ ।

সত্য। প্রহরী হইলে কি প্রকারে ?

ধীর। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছে। আমি নগরে আসিয়া আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরামিশান সিদ্ধি লইয়া আসিয়াছিলাম। যে খাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এই জামা যোড়া পাগড়ি বর্ষা যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্য। তুমি উহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপে যাইব না।

ধীর। কেন—সে কি ?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফিরিলে যে ?”

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক। উভয়েই আজ রাত্রে অল্প প্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেল। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগার-মধ্যে বাস করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অগ্ৰাণ্ণ লোকের মধ্যে জীবানন্দের কাণে সে গান গেল। মহেন্দ্রের অনুবর্তী হইবার তাহার প্রতি আদেশ ছিল, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। পথিমধ্যে একটী স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সাতদিন খায় নাই, রাস্তার ধারে পড়িয়াছিল। তাহার জীবনদান জগ্ৰ জীবানন্দ দণ্ড দুই বিলম্ব করিয়াছিলেন। মাগীকে বাঁচাইয়া তাহাকে অতি কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে দিতে (বিলম্বের অপরাধ তার) এখন আসিতেছিলেন। দেখিলেন, প্রভুকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—প্রভু গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন।

জীবানন্দ মহাপ্রভু, সত্যানন্দের সঙ্কেত সকল বুঝিতেন।

“ধীরসমীরে, তটিনীতীরে,

বসতি বনে বরনারী”

নদীর ধারে আবার কোন মাগী না খেয়ে পড়িয়া আছে না কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া, জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। জীবানন্দ দেখিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মচারী স্বয়ং মুসলমান কর্তৃক নীত হইতেছেন। এস্থলে, ব্রহ্মচারীর উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কাজ। কিন্তু জীবানন্দ ভাবিলেন, “এ সঙ্কেতের সে অর্থ নয়। তাঁর জীবনরক্ষার আপক্ষাও তাঁহার আশ্রাপালন বড়—এই তাঁহার কাছে প্রথম শিখিয়াছি। অতএব তাঁহার আশ্রাপালনই করিব।”

নদীর ধারে ধারে জীবানন্দ চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে নদীতীরে দেখিলেন যে এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিতা শিশুকণ্ঠা। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে মহেন্দ্রের স্ত্রী কণ্ঠাকে জীবানন্দ একবারও দেখেন নাই। মনে করিলেন, হইলে হইতে পারে যে ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী কণ্ঠা কেন না প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিলাম। যাহা হউক মাত মৃতা, কণ্ঠাটী জীবিত। আগে ইহার রক্ষাবিধান করা চাই—নহিলে বাঘ ভালুকে খাইবে। ভবানন্দ ঠাকুর এইখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সংকার করিবেন, এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে তুলিয়া জীবানন্দ গৌসাই সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর। ভরুইপুরে কতকগুলি সামান্য লোকের বাস, নিকটে আর বড় গ্রাম নাই, গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারিদিকে জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমলতৃণাবৃত গোচারণভূমি, কোমল শ্রামল পল্লবযুক্ত আম, কাঁটাল, জাম, তালের বাগান, মাঝে নীলজলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীঘিকা। তাহাতে জলে বক, হংস, ডাছক; তীরে কোকিল, চক্রবাক; কিছু দূরে ময়ূর উচ্চরবে কেকাধ্বনি করিতেছে। গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গণে গাভী, গৃহের মধ্যে মরুই, কিন্তু আজ কাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই—কাহারও চালে একটা ময়নার পিঁজরে, কাহারও দেয়ালে আলিপনা—কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলই দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষ,

শীর্ণ, সস্তাপিত । তথাপি এই গ্রামের লোকের একটু শ্রীছাঁদ আছে—জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এজন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল ।

একটা বৃহৎ আম্রকানন মধ্যে একটা ছোট বাড়ী । চারিদিকে মাটির প্রাচীর, চারিদিকে চারিখানি ঘর । গৃহস্থের গোরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে, একটা টিয়া আছে । একটা বাঁদর ছিল, কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে । একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবুগাছ আছে, গোটাকত মল্লিকা যুঁইয়ের গাছ আছে, কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই । সব ঘরের দাওয়ায় একটা একটা চরকা আছে; কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই । জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল ।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটা ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া একটা চরকা লইয়া ঘেনর ঘেনর আরম্ভ করিলেন । সে ছোট মেয়েটী কখন চরকার শব্দ শুনে নাই । বিশেষতঃ মা ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে, চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও উচ্চ সপ্তকে উঠিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল । তখন ঘরের ভিতর হইতে একটা সতের কি আঠার বৎসরের মেয়ে বাহির হইল । মেয়েটী বাহির হইয়াই দক্ষিণ গাঙে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল । “এ কে এ ? দাদা চরকা কাটো কেন ? মেয়ে কোথা পেলে ? দাদা তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—আবার বিয়ে করেছ না কি ?”

জীবানন্দ মেয়েটা আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাহাকে কীল মারিতে উঠিলেন, বলিলেন, “বাদরী, আমার আবার মেয়ে, আমাকে কি হেজিপেঁজি পেলি না কি? ঘরে দুধ আছে?”

তখন সে যুবতী বলিল, “দুধ আছে বই কি, খাবে?”

জীবানন্দ বলিল, “হাঁ খাব।”

তখন সে যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুধ জ্বাল দিতে গেল। জীবানন্দ ততক্ষণ চরকা ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিলেন। মেয়েটা সেই যুবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না। মেয়েটা কি ভাবিয়াছিল বলিতে পারি না—বোধ হয় এই যুবতীকে ফুলকুমতুল্য সুন্দরী দেখিয়া মা মনে করিয়াছিল। বোধ হয় উননের তাপের আঁচ মেয়েটাকে একবার লাগিয়াছিল তাই সে একবার কাঁদিল। কান্না শুনিবামাত্র জীবানন্দ বলিলেন, “ও নিমি! ও পোড়ারমুখি! ও হনুমানি! তোর এখনও দুধ জ্বাল হলো না?” নিমি বলিল, “হয়েছে।” এই বলিয়া সে পাথর বাটীতে দুধ ঢালিয়া জীবানন্দের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। জীবানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “ইচ্ছা করে যে এই তপ্ত দুধের বাটী তোর গায়ে ঢালিয়া দিই—তুই কি মনে করেছিস্ আমি খাব না কি?”

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কে খাবে?”

জীবা। ঐ মেয়েটা খাবে দেখ্‌ছিস্‌নে, ঐ মেয়েটাকে দুধ খাওয়া।

নিমি তখন আসনপিড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হইতে ফোঁটাকত জল পড়িল। তাহার একটা

ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল,—

“হ্যাঁ দাদা কার মেয়ে দাদা ?”

জীবানন্দ বলিলেন, “তোমার কিরে পোড়ারমুখী ?”

নিমি বলিল, “আমায় মেয়েটী দেবে ?”

জীবানন্দ বলিল, “তুমি মেয়ে নিয়ে কি করবি।”

নিমি। “আমি মেয়েটীকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব—” বলতে বলতে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে আবার হাসে।

জীবানন্দ বলিল, “তুমি নিয়ে কি করবি ? তোমার কত ছেলে মেয়ে হবে।”

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটী দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। উটী কায়েতের মেয়ে, আমি চল্লুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে। আমার মাথা খাও, দুটী খেয়ে যাও।

জীবা। তোমার মাথাও খাব, আবার দুটী খাব ? তুমি ত পেরে উঠবো না দিদি। মাথা রেখে দুটী ভাত দে।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া জায়গা মুছিয়া মল্লিকা ফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলায়ের দাল, জঙ্গুলে ডুমুরের

দালনা, পুকুরের রুইমাছের ঝোল, এবং ছুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল । খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন,

“নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর ? তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসে নি ?”

নিমি বলিল, “মন্বন্তর আসবে না কেন, বড় মন্বন্তর, তা আমরা ছুটি মানুষ, ঘরে যা আছে, লোককে দিই খুই ও আপনারা খাই । আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই ?—তুমি যে সেই বলিয়া গেলে, বনে বৃষ্টি হয় । তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই শহরে বেচে এলো—আমরা বেচি নাই ।”

জীবানন্দ বলিল, “বোনাই কোথা ?”

নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, সের হুই তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন । কে নাকি চাল চেয়েছে ?”

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই । জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্ গপ্ টপ্ টপ্ সপ্ সপ্ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন । এখন শ্রীমতী নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্ত রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জন গুলি আনিয়া, ঢালিয়া দিলেন । জীবানন্দ ক্রম্বেপ না করিয়া সে সকলই উদরনামক বৃহৎ গর্তে প্রেরণ করিলেন । তখন নিমাইমণি বলিল, “দাদা আর কিছু খাবে ?”

জীবানন্দ বলিল, “আর কি আছে ?”

নিমাইমণি বলিল, “একটি পাকা কাঁটাল আছে ।”

নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটাকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন । তখন নিমাই হাসিয়া বলিল,

“দাদা আর কিছু নাই ।”

দাদা বলিলেন, ‘তবে যা । আর এক দিন আসিয়া খাইব ।’

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল । জল দিতে দিতে নিমাই বলিল “দাদা, আমার একটা কথা রাখিবে ?”

জীবা । কি ?

নিমি । আমার মাথা খাও ।

জীবা । কি বল্‌না পোড়ারমুখী ।

নিমি । কথা রাখিবে ?

জীবা । কি আগে বল্‌না ।

নিমি । আমার মাথা খাও পায়ে পড়ি ।

জীবা । তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড়্, কিন্তু কি বল্ ?

নিমাই তখন এক হাতে আর এক হাতের আঙ্গুলগুলি টিপিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া একবার মাটিপানে চাহিয়া শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল, “একবার বউকে ডাকবো ?”

জীবানন্দ আঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত ; বলিলেন “আমার মেয়ে ফিরিয়ে দে, আর আমি একদিন তোর চাল দাল ফিরিয়া দিয়া যাইব । তুই বাঁদরী;

তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বলবার তাই আমাকে বলিস্।”

নিমাই বলিল, “তা হউক, আমি বাঁদরী, আমি পোড়ার-মুখী। একবার বোঁকে ডাকবো?”

জীবা। আমি চল্লুম, এই বলিয়া জীবানন্দ হন্থন্থ করিয়া বাহির হইয়া যায়,—নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, দ্বারের কবাট রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বলিল, “আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বোঁয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারবে না।”

জীবানন্দ বলিল, “আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি, তা তুই জানিস্?”

এই বার নিমি রাগ করিল, বলিল “বড় কীর্ত্তিই করেছ—স্ত্রী ত্যাগ করবে, লোক মারবে, আমি তোমায় ভয় করবো! তুমিও যে বাপের সন্তান, আমিও সেই বাপের সন্তান—লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।”

জীবানন্দ হাসিল, “ডেকে নিয়ে আয়—কোন্ পাপিষ্ঠাকে ডেকে নিয়ে আস্বি নিয়ে আয়, কিন্তু দেখ্ ফের যদি এমন কথা বল্বি, তোকে কিছু বলি না বলি, সেই শালার ভাই শালাকে মাথা মুড়াইয়া দিয়া ঘোল চেলে উল্টা গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিব।”

নিমি মনে মনে বলিল, “আমিও তা হলে বাঁচি।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল, নিকটবর্তী এক পর্ণকুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীরমধ্যে শতগ্রস্থিযুক্ত

বসনপরিধানা রুক্মকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতে ছিল। নিমাই গিয়া বলিল, “বৌ শিগ্গির, শিগ্গির!” বৌ বলিল, “শিগ্গির কি লো! ঠাকুর জামাই তোকে মেরেছে নাকি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?”

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে?

সে স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তার পর তাহাকে এক কীল মারিয়া বলিল “তোমার সেই ঢাকাই কোথা আছে বল।” সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল, “কি লো তুই কি খেপেছিস্ নাকি?”

নিমাই ছম করিয়া তাহার পিঠে এক কীল মারিল, বলিল “শাড়ী বের কর।”

রঙ্গ দেখিবার জন্ত সে স্ত্রীলোক শাড়ীখানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্ত, কেন না এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে বৃত্তি তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন, ফুলকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য; তৈল নাই,—বেশ নাই—আহার নাই—তবু সেই প্রদীপ্ত, অননুমেষ সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যেও প্রস্ফুটিত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য। আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর

সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্কচনীয় কি ছিল! অনির্কচনীয় মাধুর্য্য, অনির্কচনীয় উন্নতভাব, অনির্কচনীয় প্রেম, অনির্কচনীয় ভক্তি। সে হাসিতে হাসিতে (কেহ সে হাসি দেখিল না) হাসিতে হাসিতে সেই ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া দিল। বলিল, “কি লো নিমি, কি হইবে?” নিমাই বলিল, “তুই পর্বি,?” সে বলিল, “আমি পরিলে কি হইবে?” তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্ঠন করিয়া বলিল, “দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।” সে বলিল, “আমায় যেতে বলেছেন! ত ঢাকাই শাড়ী কেন, চল না এমনি যাই।” নিমাই তার গালে এক চড় মারিল—সে নিমায়ের কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটারের বাহির করিল। বলিল, “চল এই ঝাকড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।” কিছুতেই কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গম্ভীরবসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন গৃহ আলো হইল। বোধ হইল পাতায় ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন কোথায় গোলাপজলের কার্কা মুখ আটা ছিল, কে কার্কা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধূপ ধূনা গুণ্ণুল ফেলিয়া দিল। সে রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, প্রথমে ত দেখিতে পাইল না। তার পর দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটা ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আশ্রয়ের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। বলি না যে তাহার চক্ষে জল আসিল না, জগদীশ্বর জানেন, যে তাহার চক্ষে যে স্রোতঃ আসিয়াছিল, বহিলে তাহা জীবানন্দকে ভাসাইয়া দিত; কিন্তু সে তাহা বহিতে দিল না। জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল, “ছি কাঁদিও না, আমি জানি তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না—তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।”

জীবানন্দ মাথা তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন, “শান্তি ! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিনবস্ত্র কেন ? তোমার ত খাইবার পরিবার অভাব নাই ।”

শান্তি বলিল, “তোমার ধন, তোমারই জন্য আছে । আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয় তাহা জানি না । যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে আবার গ্রহণ করিবে—”

জীবা । গ্রহণ করিব—শান্তি ! আমি কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছি ?

শান্তি । ত্যাগ নহে—যবে তোমার ব্রত সঙ্গ হইবে, যবে আবার আমায় ভাল বাসিবে—

কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ শান্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন । দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে বলিলেন,

“কেন দেখা করিলাম !”

শান্তি । কেন করিলে—তোমার ত ব্রত ভঙ্গ করিলে ?

জীবা । ব্রত ভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে । তাহার জন্য ভাবি না, কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না । আমি এই জন্য নিমাইকে বলিয়াছিলাম যে, দেখায় কাজ নাই । তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না । একদিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎসংসার ; একদিকে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ ; সবই একদিকে আর এক দিকে তুমি । একা তুমি । আমি সকল সময় বুঝিতে পারি না যে, কোন্ দিক্ ভারি হয় । দেশ ত শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব ? দেশের এক কাঠা ছুঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ

কি ? দেশের লোকের হুঃখ,—যে তোমা হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল—তাহার অপেক্ষা দেশে আর কে হুঃখী আছে ? যে তোমার অঙ্গে শতগ্রহিণী বস্ত্র দেখিল, তাহার অপেক্ষা দরিদ্র দেশে আর কে আছে ? আমার সকল ধর্মের সহায় তুমি ! সে সহায় যে ত্যাগ করিল, তার কাছে আবার সনাতন ধর্ম কি ? আমি কোন্ ধর্মের জন্য দেশে দেশে, বনে বনে, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, প্রাণিহীনা করিয়া এই পাপের ভার সংগ্রহ করি ? পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না জানি না ; কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ । চল গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না ।

শান্তি কিছু কাল কথা কহিতে পারিল না । তার পর বলিল, “ছি—তুমি বীর । আমার পৃথিবীতে বন্দু মুখ যে, আমি বীরপত্নী । তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম ত্যাগ করিবে ? তুমি আমার ভালবাসিও না—আমি সে মুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম কখন ত্যাগ করিও না । দেখ—আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—এ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি ?”

জীবানন্দ বলিলেন, “প্রায়শ্চিত্ত—দান—উপবাস—১২ কাহণ কড়ি ।”

শান্তি ঈষৎ হাসিল । বলিল, “প্রায়শ্চিত্ত কি তা আমি জানি । এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত—শত অপরাধে কি তাই ?”

জীবানন্দ বিস্মিত ও বিবগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ।

“এ সকল কথা কেন ?”

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিল, “সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না, কিন্তু চোখ ভরিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, একদিন অবশ্য সে দেখা দেখিব। একদিন অবশ্য আমাদের মনস্কামনা সফল হইবে। আমি এখন চলিলাম, তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বোশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর।”

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল “তুমি এখন কোথায় যাইবে।”

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধান যাইব। তিনি যে ভারেনগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি; দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন। এমত সময়ে বিষণ্মুখে জ্ঞানানন্দনামা একজন অতি তেজস্বী সন্তান তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, “গৌসাই মুখ অত ভারি কেন?”

জ্ঞানানন্দ বলিলেন, “কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। কালিকার কাণ্ডটার জন্ত নেড়েরা গেরুয়া কাপড় দেখিতেছে,

আর ধরিতেছে। অপরাপর সন্তানগণ আজ সকলেই গৈরিক বসন ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সত্যানন্দ প্রতু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি, যদি তিনি মুসলমানের হাতে পড়েন।”

ভবানন্দ বলিলেন, “তঁাহাকে আটক রাখে এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই। ধীরানন্দ তাঁহার পশ্চাৎদামী হইয়াছেন জানি। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি। তুমি মঠ রক্ষা করিও।”

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল, গেরুয়া বসনের পরিবর্তে চুড়িদার পায়জামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা, এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল। মুখ হইতে ত্রিপুণ্ড্রাদি চন্দনচিহ্ন সকল বিলুপ্ত করিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফাশ্রশোভিত সুন্দর মুখমণ্ডল অপূর্কশোভা পাইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগল জাতীয় যুবা পুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেখান হইতে ক্রোশৈক দূরে দুইটী অতি অনুচ্চ পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ের উপর জঙ্গল উঠিয়াছে। সেই দুইটী পাহাড়ের মধ্যে একটী নিভৃত স্থান ছিল। তথায় অনেকগুলি অশ্ব রক্ষিত হইয়াছিল। মঠবাসীদিগের অশ্বশালা এইখানে। ভবানন্দ তাহার মধ্য হইতে একটী অশ্ব উন্মোচন করিয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

যাইতে যাইতে সহসা তাঁহার গতিরোধ হইল। সেই পখি-
 পার্শ্বে কলনাদিনী-তরঙ্গিণীর কুলে, গগনভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায়,
 কাদম্বিনীচ্যুত বিছ্যতের ন্যায়, দীপ্ত স্ত্রীমূর্তি শয়ান দেখিলেন।
 দেখিলেন জীবনলক্ষণ কিছু নাই—শূন্য বিষের কোটা পড়িয়া
 আছে। ভবানন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ভীত হইলেন। জীবা-
 নন্দের ন্যায়, ভবানন্দও মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যাকে দেখেন নাই।
 জীবানন্দ যে সকল কারণে সম্মেহ করিয়াছিলেন যে এ মহে-
 ন্দ্রের স্ত্রীকন্যা হইতে পারে—ভবানন্দের কাছে সে সকল কারণ
 অনুপস্থিত। তিনি ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে বন্দীভাবে নীত
 হইতে দেখেন নাই—কন্যাটীও সেখানে নাই। কোটা দেখিয়া
 বুঝিলেন কোন স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ
 সেই শবের নিকট বসিলেন, বসিয়া কপোলে কর লগ্ন করিয়া
 অনেকক্ষণ ভাবিলেন। মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া
 দেখিলেন; অনেক প্রকার অপরের অপরিজ্ঞাত পরীক্ষা করি-
 লেন। তখন মনে মনে বলিলেন, এখনও সময় আছে, কিন্তু
 বাঁচাইয়া কি করিব। এইরূপ ভবানন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা
 করিলেন, চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা বৃক্ষের
 কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া
 রস করিয়া সেই শবের ওষ্ঠ দস্ত ভেদ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কিছু
 মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, পরে নাসিকায় কিছু কিছু রস
 দিলেন—অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ
 এইরূপ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে নাকের কাছে হাত
 দিয়া দেখিতে লাগিলেন, যে নিশ্বাস বহিতেছে কি না। বোধ
 কইল যেন যত্ন বিফল হইতেছে। এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা

করিতে করিতে ভবানন্দের মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল—অপুণিতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন । তখন আরও পত্ররস নিষেক করিতে লাগিলেন । ক্রমে নিশ্বাস প্রখরতর বহিতে লাগিল । নাড়ীতে হাত দিয়া ভবানন্দ দেখিলেন, নাড়ীর গতি হইয়াছে । শেষে অল্পে অল্পে পূর্বদিকের প্রথম প্রভাতরাগ বিকাশের ঞ্চায়, প্রভাতপদ্মের প্রথমোন্মেষের ঞ্চায়, প্রথম প্রেমানুভবের ঞ্চায় কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন । দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তান সম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারি-
য়াছিল, যে সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র দুই জনে বন্দী
হইয়া নগরের কাণাগারে আবদ্ধ আছে । তখন একে একে,
হুয়ে হুয়ে, দশে দশে, শতে শতে, সন্তানসম্প্রদায় আসিয়া সেই
দেবালয়বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিল । সকলেই
নৃশস্ত্র । নয়নে রোষাগ্নি, মুখে দস্ত, অধরে প্রতিজ্ঞা । প্রথমে
শত, পরে সহস্র, পরে দ্বিসহস্র । এইরূপে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি
পাইতে লাগিল । তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারিহস্তে
জ্ঞানানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—“আমরা অনেক
দিন হইতে মনে করিয়াছি যে এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া;

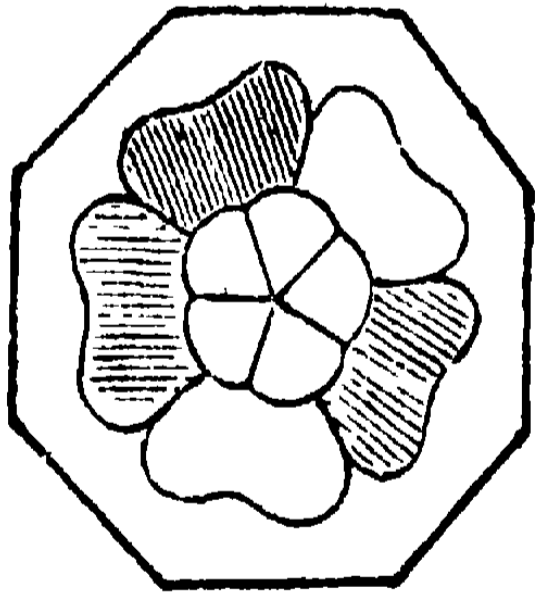
এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব । এই শূরুরের খোঁয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব । ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে । আমাদের গুরুর গুরু, পরম গুরু, যিনি অনন্তজ্ঞানময়, সর্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি দেশহিতৈষী, যিনি সনাতন ধর্মের পুনঃ প্রচার জন্ত শরীরপাতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার স্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানের কাঁরাগারে বন্দী । আমাদের তরবারে কি ধার নাই ?” হস্ত প্রসারণ করিয়া জ্ঞানানন্দ বলিলেন, “এ বাহতে কি বল নাই ?”—বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, “এ হৃদয়ে কি সাহস নাই ?—ভাই ডাক, হরে মুরারে মধুকৈটভারে !—যিনি মধুকৈটভ বিনাশ করিয়াছেন—যিনি হিরণ্যকশিপু, কংস, দম্ভবক্র, শিশুপাল প্রভৃতি দুর্জয় অসুরগণের নিধন সাধন করিয়াছেন—যাঁহার চক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শব্দুও ভীত হইয়াছিলেন—যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা, আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহতে অনন্ত বল—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই আমাদের রণজয় হইবে । চল আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলি, গুঁড়ি করি । সেই শূকরনিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিই । সেই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া খড় কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই । বল—হরে মুরারে মধুকৈটভারে !”

তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে সহস্র সহস্র কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, “হরে মুরারে মধুকৈটভারে !” সহস্র অসি একেবারে ঝনৎকার শব্দ করিল । সহস্র বল্লম

ফলক সহিত উর্দ্ধে উখিত হইল । সহস্র বাহুর আক্ষোটে বজ্রনিদাদ হইতে লাগিল । সহস্র ঢোল যোদ্ধৃবর্গের কর্কশ পৃষ্ঠে তড় বড় শব্দ করিতে লাগিল । মহাকোলাহলে পশু সকল ভীত হইয়া কানন হইতে পলাইল । পক্ষী সকল ভয়ে উচ্চরব করিয়া গগনে উঠিয়া গগন আচ্ছন্ন করিল । সেই সময়ে শত শত জয়চক্কা একেবারে নিনাদিত হইল । তখন “হরে মুরারে মধুকৈটভারে !” বলিয়া কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল । ধীর, গম্ভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগরাভিমুখে চলিল । বস্ত্রের মর্ম্মর শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দ, কর্ণের অক্ষুট নিনাদ, মধ্যো মধ্যো তুমুলরবে হরিবোল । ধীরে, গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে, সেই সন্তানবাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল । অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই । নগররক্ষীরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল ।

এদিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া কারাগার ভাঙ্গিয়া রক্ষিবর্গকে মারিয়া ফেলিল । এবং সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল । তখন অতিশয় হরিবোলের গোলযোগ পড়িয়া গেল । সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াই, তাহারা যেখানে মুসলমানের গৃহ দেখিল আশ্বিন ধরাইয়া দিল । তখন সত্যানন্দ বলিলেন, “ফিরিয়া চল, অনর্থক অনিষ্ট সাধনে প্রয়োজন নাই ।” সন্তানদিগের এই সকল দৌরায়ে্যের সংবাদ পাইয়া, দেশের,

কর্তৃপক্ষগণ তাহাদিগের দমনার্থ একদল “পরগণা সিপাহী” পাঠাইলেন। তাহাদের কেবল বন্দুক ছিল, এমত নহে, একটা কামানও ছিল। সন্তানেরা তাহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দকানন হইতে নির্গত হইয়া, যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু লাঠি সড়কি বা বিশ পঁচিশটা বন্দুক কামানের কাছে কি করিবে? সন্তানগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।



দ্বিতীয় খণ্ড ।





দ্বিতীয় খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শান্তির অল্পবয়সে, অতি শৈশবে, মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল ।
যে সকল উপাদানে শান্তির চরিত্র গঠিত, ইহা তাহার মধ্যে
একটী প্রধান । তাহার পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ ছিলেন ।
তাঁহার গৃহে অণু স্ত্রীলোক কেহ ছিল না ।

কাজেই, শান্তির পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন,
শান্তি গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত । টোলে কতকগুলি
ছাত্র বাস করিত ; শান্তি অন্য সময়ে তাহাদিগের কাছে
বসিয়া খেলা করিত, তাহাদিগের কোলে পিঠে চড়িত ; তাহারাও
শান্তিকে আদর করিত ।

এইরূপে শৈশবে নিয়ত পুরুষসাহচর্যের প্রথম ফল এই
হইল, যে শান্তি মেয়ের মত কাপড় পরিতে শিখিল না, অথবা
শিখিয়া পরিত্যাগ করিল । ছেলের মত কোঁচা করিয়া কাপড়

পরিতে আরম্ভ করিল, কেহ কখন মেয়ে কাপড় পরাইয়া দিলে, তাহা খুলিয়া ফেলিত, আবার কোঁচা করিয়া পরিত । টোলের ছাত্রেরা খোঁপা বাঁধে না; অতএব শাস্তিও কখন খোঁপা বাঁধিত না—কে বা তার খোঁপা বাঁধিয়া দেয়? টোলের ছাত্রেরা কাঠের চিরুণী দিয়া তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিত, চুলগুলি কুণ্ডলী করিয়া শাস্তির পিঠে, কাঁধে, বাহুতে, ও গালের উপর ছলিত । ছাত্রেরা ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত; শাস্তিও ফোঁটা করিত, চন্দন মাখিত । যজ্ঞোপবীত গলায় দিতে পাইত না, বলিয়া শাস্তি বড় কাঁদিত । কিন্তু সন্ধ্যা-হিকের সময়ে ছাত্রদিগের কাছে বসিয়া, তাহাদের অনুকরণ করিতে ছাড়িত না । ছাত্রেরা অধ্যাপকের অবর্তমানে, অশ্লীল সংস্কৃতির দুইচারিটা বুক্‌নি দিয়া, দুই একটা আদিরসাত্মিত গল্প করিতেন, টিয়া পাখির মত শাস্তি সেগুলিও শিখিল— টিয়া পাখির মত, তাহার অর্থ কি, তাহা কিছুই জানিত না ।

দ্বিতীয় ফল, এই হইল যে শাস্তি একটু বড় হইলেই ছাত্রেরা যাহা পড়িত, শাস্তিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিখিতে আরম্ভ করিল । ব্যাকরণের এক বর্গ জানে না, কিন্তু ভড়ি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক ব্যাখ্যা সহিত মুখস্থ করিতে লাগিল । দেখিয়া শুনিয়া, শাস্তির পিতা “যদ্ভবিষ্যতি তদ্ভবিষ্যতি” বলিয়া শাস্তিকে মুগ্ধবোধ আরম্ভ কবাইলেন । শাস্তি বড় শীঘ্র শীঘ্র শিখিতে লাগিল । অধ্যাপক বিস্ময়াপন্ন হইলেন । ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা সাহিত্যও পড়াইলেন । তার পর সব গোলমাল হইয়া গেল । পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল ।

তখন শাস্তি নিরাশ্রয় । টোল উঠিয়া গেল; ছাত্রেরা চলিয়া

গেল । কিন্তু শান্তিকে তাহারা ভাল বাসিত—শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না । একজন তাহাকে দয়া করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল । ইনিই পশ্চাৎ সন্তান-সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন । আমরা তাঁহাকে জীবানন্দই বলিতে থাকিব ।

তখন জীবানন্দের পিতা মাতা বর্তমান । তাঁহাদিগের নিকট জীবানন্দ কন্যাটির সবিশেষ পরিচয় দিলেন । পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন এ পরের মেয়ের দায় ভার নেয় কে ?” জীবানন্দ বলিল, “আমি আনিয়াছি—আমিই দায় ভার গ্রহণ করিব । পিতা মাতা বলিলেন, “ভালই !” জীবানন্দ অনুচ,—শান্তির বিবাহবয়স উপস্থিত । অতএব জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিলেন ।

বিবাহের পর, রিতে লেই অনুতাপ করিতে লাগিলেন । সকলেই বুঝিলেন, “কাজটা ভাল হয় নাই ।” শান্তি কিছুতেই মেয়ের মত কাপড় পরিল না ; কিছুতেই চুল বাধিল না । সে বাটার ভিতর থাকিত না ; পাড়ার ছেলের সঙ্গে মিলিয়া খেলা করিত । জীবানন্দের বাড়ীর নিকটেই জঙ্গল, শান্তি জঙ্গলের ভিতর একা প্রবেশ করিয়া কোথায় ময়ূর, কোথায় হরিণ, কোথায় দুর্লভ ফুল ফল, এই সকল খুঁজিয়া বেড়াইত । শ্বশুর শ্বশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভৎসনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল । পীড়াপীড়িতে শান্তি বড় জ্বালাতন হইল । একদিন দ্বার খোলা পাইয়া শান্তি কাহাকে না বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল ।

জঙ্গলের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া কাপড় ছোবাইয়া শান্তি বাচ্ছা সন্ন্যাসী সাজিল। তখন বাঙ্গালা ছুড়িয়া দলে দলে সন্ন্যাসী ফিরিত। শান্তি ভিক্ষা করিয়া খাইয়া জগন্নাথক্ষেত্রের রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। অল্পকালেই সেই পথে একদল সন্ন্যাসী দেখা দিল। শান্তি তাহাদের সঙ্গে মিশিল।

তখন সন্ন্যাসীরা এখনকার সন্ন্যাসীদের মত ছিল না। তাহারা দলবদ্ধ, সুশিক্ষিত, বলিষ্ঠ, যুদ্ধবিশারদ, এবং অত্যাশ্চর্য গুণে গুণবান্ ছিল। তাহারা সচরাচর এক প্রকার রাজবিদ্রোহী—রাজার রাজস্ব লুটিয়া খাইত। বলিষ্ঠ বালক পাইলেই তাহারা অপহরণ করিত। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া আপনাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত করিত ই এজন্য তাহাদিগকে ছেলেধরা বলিত।

শান্তি বালকসন্ন্যাসিবেশে ইহাদের এক সম্প্রদায় মধ্যে মিশিল। তাহারা প্রথমে তাহার কোমলাঙ্গ দেখিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, কিন্তু শান্তির বুদ্ধির প্রার্থ্যা, চতুরতা, এবং কৰ্মদক্ষতা দেখিয়া আদর করিয়া দলে লইল। শান্তি তাহাদিগের দলে থাকিয়া, ব্যায়াম করিত, অস্ত্রশিক্ষা করিত, এবং পরিশ্রমসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া অনেক দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিল; অনেক লড়াই দেখিল, এবং অনেক কাজ শিখিল।

ক্রমশঃ তাহার যৌবনলক্ষণ দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল, যে এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক। কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়; কেহ কোন কথা কহিল না।

সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে পণ্ডিত ছিল। শান্তি সংস্কৃতে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে দেখিয়া, একজন পণ্ডিত সন্ন্যাসী তাহাকে পড়াইতে লাগিলেন। সচরাচর সন্ন্যাসীরা জিতেন্দ্রিয় বলিয়াছি, কিন্তু সকলে নহে। এই পণ্ডিতও নহেন। অথবা তিনি শান্তির অভিনব যৌবনবিকাশজনিত লাভণ্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয় কর্তৃক পুনর্বার নিপীড়িত হইতে লাগিলেন। শিষ্যকে আদিরসাপ্রিত কাব্য সকল পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, আদিরসাপ্রিত কবিতাগুলির অশ্রাব্য ব্যাখ্যা শুনাইতে লাগিলেন। তাহাতে শান্তির কিছু অপকার না হইয়া কিছু উপকার হইল। লজ্জা কাহাকে বলে, শান্তি তাহা শিখে নাই, এখন স্ত্রীস্বভাব-সুলভ লজ্জা আসিয়া আপনি উপস্থিত হইল। পৌরুষচরিত্রের উপর নিশ্চল স্ত্রীচরিত্রের অপূর্বপ্রভা আসিয়া পড়িয়া, শান্তির গুণগ্রাম উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। শান্তি পড়া ছাড়িয়া দিল।

ব্যাধ যেমন হরিণীর প্রতি ধাবমান হয়, শান্তির অধ্যাপক শান্তিকে দেখিলেই তাহার প্রতি সেইরূপ ধাবমান হইতে লাগিলেন। কিন্তু শান্তি ব্যায়ামাদির দ্বারা পুরুষেরও দুর্লভ বলসঞ্চয় করিয়াছিল, অধ্যাপক নিকটে আসিলেই তাঁহাকে কিল ঘুষার দ্বারা পূজিত করিত—কিল ঘুষাগুলি সহজ নহে। একদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর শান্তিকে নির্জনে পাইয়া বড় জোর করিয়া শান্তির হাতখানা ধরিলেন, শান্তি ছাড়াইতে পারিল না। কিন্তু সন্ন্যাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে হাতখানা শান্তির বাঁ হাত; দাহিন হাতে শান্তি তাহার রূপালে এমন জোরে ঘুষা মারিল, যে সন্ন্যাসী মুর্ছিত হইয়া পড়িল। শান্তি সন্ন্যাসিসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া পলালন করিল।

শান্তি ভয়শূন্য। একাই স্বদেশের সন্ধানে যাত্রা করিল। সাহসের ও বাহুবলের প্রভাবে নির্বিঘ্নে চলিল। ভিক্ষা করিয়া অথবা বণ্ট ফলের দ্বারা উদর পোষণ করিতে করিতে, এবং অনেক মারামারিতে জয়ী হইয়া, শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল শ্বশুর স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্বশুরী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না,—জাতি যাইবে। শান্তি বাহির হইয়া গেল।

জীবানন্দ বাড়ী ছিলেন। তিনি শান্তির অনুবর্তী হইলেন। পথে শান্তিকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেন আমার গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? এত দিন কোথায় ছিলে?” শান্তি সকল সত্য বলিল। জীবানন্দ সত্য মিথ্যা চিনিতে পারিতেন। জীবানন্দ শান্তির কথায় বিশ্বাস করিলেন।

অপ্সরোগণের ক্রবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতি ষড়ে নির্মিত যে সম্মোহন শর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না। ইংরেজ পূর্ণিমার রাত্রে রাজপথে গাম ছালে, বাঙ্গালী তেলা মাথায় তেল ঢালিয়া দেয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাক, চন্দ্রদেব, সূর্য্যদেবের পরেও কখন কখন আকাশে উদ্ভিত থাকেন, ইন্দ্র সাগরে বৃষ্টি করেন; যে সিদ্ধবে টাকা ছাপাছাপি, কুবের সেই সিদ্ধকেই টাকা লইয়া যান; যম ষার প্রায় সবগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন, তারই বাকিটিকে লইয়া যান। কেবল রতিপতির এমন নিরুদ্ভির কাজ দেখা যায় না। যেখানে গাঁটছাড়া বাঁধা হইল—সেখানে আর তিনি পরিশ্রম করেন না, প্রজাপতির উপর সকল ভার দিয়া, যাহার হৃদয়শোণিত পান করিতে পারিবেন তাহার সন্ধান

যান । কিন্তু আজ বোধ হয় পুষ্পবন্যার কোন কাজ ছিল না—হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন । একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল—আর একটা আসিয়া শান্তির বুক পড়িয়া প্রথম শান্তিকে জানাইল যে সে বুক মেয়ে মানুষের বুক—বড় নরম জিনিষ । নবমেঘনিম্মুক্ত প্রথম জলকণা-নিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া, উৎফুল্লনয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল ।

জীবানন্দ বলিল, “আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না । আমি যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ তুমি দাঁড়াইয়া থাক ।”

শান্তি বলিল, “তুমি ফিরিয়া আসিবে ত ?” জীবানন্দ কিছু উত্তর না করিয়া, কোন দিক না চাহিয়া সেই পথিপার্শ্বস্থ নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় শান্তির অধরে অধর দিয়া সুধাপান করিলাম মনে করিয়া, প্রস্থান করিলেন ।

মাকে বুঝাইয়া, জীবানন্দ মার কাছে বিদায় লইয়া আসিলেন । ভৈরবীপুরে সম্প্রতি তাঁহার ভগিনী নিমাইয়ের বিবাহ হইয়াছিল । ভগিনীপতির সঙ্গে জীবানন্দের একটু সম্প্রীতি হইয়াছিল । জীবানন্দ শান্তিকে লইয়া সেই খানে গেলেন । ভগিনীপতি একটু ভূমি দিল । জীবানন্দ তাহার উপর এক কুটার নির্মাণ করিলেন । তিনি শান্তিকে লইয়া সেইখানে সুখে বাস করিতে লাগিলেন । স্বামিসহবাসে শান্তির চরিত্রের পৌরুষ দিন দিন বিলীন বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আসিল । রমণীয় রমণীচরিত্রের নিত্য নবোন্মেষ হইতে লাগিল । সুখস্বপ্নের মত তাঁহাদের জীবন নির্ঝাহিত হইত ; কিন্তু সহসা সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল । জীবানন্দ সত্যানন্দের হাতে পড়িয়া, সন্তানধর্ম

গ্রহণপূর্বক, শান্তিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন । পরিত্যাগের পর তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ নিমাইয়ের কোশলে ঘটিল । তাহাই আমি পূর্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত করিয়াছি ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল । নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকট আসিয়া বসিল । শান্তির চোখে আর জল নাই ; শান্তি চোখ মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাসিতেছে । কিছু গস্তীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অন্তমনা । নিমাই বলিয়া বলিল,

“তবু ত দেখা হলো ।”

শান্তি কিছু উত্তর করিল না, চুপ করিয়া রহিল । নিমাই দেখিল শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না । শান্তি মনের কথা বলিতে ভাল বাসে না, তাহা নিমাই জানিত । স্মরণঃ নিমাই চেষ্টা করিয়া অল্প কথা পাড়িল—বলিল,

“দেখ দেখি বউ কেমন মেয়েটী ।”

শান্তি বলিল,

“মেয়ে কোথা পেলি—তোমার মেয়ে হলো কবে লো ?”

নিমা । মরণ আর কি—তুমি ধর্মের বাড়ী যাও—এ যে দাদার মেয়ে ।

নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্ত এ কথাটা বলে নাই ।
“দাদার মেয়ে” অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটা পাইয়াছি ।
শান্তি তাহা বুঝিল না ; মনে করিল, নিমাই বুঝি সূচ ফুটাইবার
চেষ্টা করিতেছে । অতএব শান্তি উত্তর করিল,

“আমি মেয়ের মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার
কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি ।”

নিমাই উচিত শাস্তি পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল,

“কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে
মুড়িয়ে এনেছে, তা জিজ্ঞাসা করবার তো অবসর হলো না ।
তা এখন মন্বন্তরের দিন কত লোক ছেলে পিলে পথে ঘাটে
ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে ; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে
বেচিতে আনিয়াছিল, তা পরের মেয়ে ছেলে কে আবার
নেয় ?” (আবার সেই চক্ষে সেইকপ জল আসিল—নিমি
চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল)

“মেয়েটা দিব্য সুন্দর, নাহুস্ হুহুস্ চাঁদপানা দেখে দাদার
কাছে চেয়ে নিয়েছি ।”

তার পর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়৷ নিমাইয়ের সঙ্গে নানা-
বিধ কথোপকথন করিল । পরে নিমাইয়ের স্বামী বাড়ী
ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটীবে গেল ।
কুটীবে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উননের ভিতর হইতে কতকগুলি
ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল । অবশিষ্ট ছাইয়ের উপর
নিজের জন্ত যে ভাত রান্না ছিল, তাহা ফেলিয়া দিল । তার
পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা
আপনি বলিল, “এতদিন যাহা মনে করিয়াছিলাম, আজি তাহা

করিব। যে আশায় এতদিন করি নাই, তাহা সফল হইয়াছে। সফল কি নিষ্ফল—নিষ্ফল! এ জীবনই নিষ্ফল! যাহা সংকল্প করিয়াছি, তাহা করিব। একবারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শত বারেও তাই।”

এই ভাবিয়া শান্তি ভাতগুলি উননে ফেলিয়া দিল। বন হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিল। অন্নের পরিবর্তে তাহাই ভোজন করিল। তার পর তাহার যে ঢাকাই শাড়ীর উপর নিমাইমণির চোট, তাহা বাহির করিয়া তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যে টুকু অবশিষ্ট রহিল, গেরিমাটিতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল। বস্ত্র রঙ করিতে, শুকাইতে সক্ষ্যা হইল। সক্ষ্যা হইলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অতি চমৎকার ব্যাপারে শান্তি ব্যাপ্ত হইল। মাথায় রুক্ষ আঙুলফলম্বিত কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল, তাহা বিনাইয়া জটা তৈয়ারি করিল। রুক্ষ কেশ অপূর্ববিন্যাসবিশিষ্ট জটাভারে পরিণত হইল। তার পর সেই গৈরিক বসনখানি অর্দেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চাকু অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্দেকে হৃদয় আচ্ছাদিত করিল। ঘরে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ ছিল, বহুকালের পর শান্তি সেখানি বাহির করিল, বাহির করিয়া দর্পণে আপনার বেশ আপনি দেখিল। দেখিয়া বলিল, “হায়! কি করিয়া কি করি।” তখন দর্পণ ফেলিয়া দিয়া, যে চুলগুলি কাটা পড়িয়াছিল, তাহা লইয়া শ্মশ্রু গুম্ফ রচিত করিল। কিন্তু পরিতে পারিল না। ভাবিল, “ছি! ছি! ছি! তাও কি হয়। সে দিন কাল কি আছে! তবে বুড়ো বেটাকে

জ্বল করিবার জন্য, এ তুলিয়া রাখা ভাল।” এই ভাবিয়া শান্তি সে গুলি কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। তার পর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম বাহির করিয়া কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত শরীর আবৃত করিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নূতন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসিবেশে দারোদঘাটন পূর্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনদেবীগণ সেই নিশীথে কাননমধ্যে অপূর্ব গীতিধ্বনি শ্রবণ করিল।

গীত * ।

“দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে ।”

“সমরে চলিছু আমি হামে না ফিরাও রে ।

হরি হরি হরি হরি বলি রণরঙ্গে,

ঝাপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে,

তুমি কার কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,

রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে ।”

২

“পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমা ছেড়ে বেও না ।”

“ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা ।

নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ ক’রে কামনা,

উড়িল আমার মন, ঘরে আর রব না,

রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাও রে ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন আনন্দ মঠের ভিতর নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তাননায়ক তিন জন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ! দেবতা আমাদের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কি দোষে আমরা মুসলমানের নিকট পরাভূত হইলাম?”

সত্যানন্দ বলিলেন, “দেবতা অপ্রসন্ন নহেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয় আছে। সে দিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি, শেষ জয়ই জয়। আমার নিশ্চিত ভরসা আছে, যে যিনি এত দিন আমাদের দয়া করিয়াছেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বনমালী পুনর্বার দয়া করিবেন। তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া যে মহাব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, অবশ্য সে ব্রত আমাদের সাধন করিতে হইবে। বিমুখ হইলে আমরা অনন্ত নরক ভোগ করিব। আমাদের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন দৈবানুগ্রহে ভিন্ন কোন কার্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষকারও চাই। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই, যে আমরা নিরস্ত্র। গোলাগুলি বন্দুক কামানের কাছে লাঠি সোটা বলমে কি হইবে? অতএব আমাদের পুরুষকারের লাঘব ছিল বলিয়াই এই পরাভব

হইয়াছে । এক্ষণে আমাদের কর্তব্য, যাহাতে আমাদেরও ঐরূপ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয় ।”

জীব । সে অতি কঠিন ব্যাপার ।

সত্য । কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে ড়ানিলে ? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি ?

জীব । কি প্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব আজ্ঞা করুন ।

সত্য । সংগ্রহের জন্য আমি আজ রাত্রে তীর্থযাত্রা করিব । যতদিন না ফি'য়া আসি, ততদিন তোমরা কোন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিও না । কিন্তু সন্তানদিগের একতা রক্ষা করিও । সন্তানদিগের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইও, এবং মার বরণজয়ের জন্য অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করিও । এই ভার তোমাদিগের দুই জ্বলের উপর রহিল ।

ভবানন্দ বলিলে : “তীর্থযাত্রা করিয়া এ সকল সংগ্রহ করিবেন কি প্রকারে ? গোলাগুলি বন্দুক কামান কিনিয়া পাঠাইতে বড় গোলমাল হইবে । আর এত পাইবেন বা কোথা, বেচিবেন বা কে, আনিবেন বা কে ?”

সত্য । কিনিয়া আনিয়া আমরা কৰ্ম নিৰ্বাহ করিতে পারিব না । আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে ।

জীব । সে কি ? এই আনন্দ মঠে ?

সত্য । তাও কি হয় ? ইহার উপায় আমি বহুদিন হইতে চিন্তা করিতেছি । ঈশ্বর অত্ন তাহার স্নযোগ করিয়া দিয়াছেন । তোমরা বলিতেছিলে, ভগবান্ প্রতিকূল । আমি দেখিতেছি তিনি অনুকূল ।

ভব । কোথায় কারখানা হইবে ?

সত্য । পদচিহ্নে ।

জীব । সে কি ? সেখানে কি প্রকারে হইবে ?

সত্য । নহিলে কি জন্তু আমি মহেন্দ্র সিংহকে ও মহাব্রত গ্রহণ করিবার জন্তু এত আকিঞ্চন করিয়াছি ?

ভব । মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ?

সত্য । ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে । আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব ।

জীব । কই, মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কি আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখে নাই । তাহার স্ত্রী কন্তার কি অবস্থা হইয়াছে, কোথায় তাহাকে রাখিল ? আমি আজ একটি কন্যা নদীতীরে পাইয়া আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি । সেই কন্যার নিকট একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়াছিল । তাহা মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্তা নয় ? আমার তাই বোধ হইয়াছিল ।

সত্য । সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্তা ।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন । তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধবলে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী । কিন্তু এফণে কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যিক বিবেচনা করিলেন না ।

জীবানন্দ বলিলেন “মহেন্দ্রের স্ত্রী মরিল কিসে ?”

সত্য । বিষ পান করিয়া ।

জীব । কেন বিষ খাইল ?

সত্য । ভগবান্ তাহাকে প্রাণত্যাগ করিতে স্বপ্নাদেয় করিয়াছিলেন ।

ভব । সে স্বপ্নাদেশ কি সন্তানের কার্যোদ্ধারের জন্তই হইয়াছিল ?

সত্য । মহেন্দ্রের কাছে সেইরূপই শুনিলাম । এক্ষণে ষায়াঙ্ক কাল উপস্থিত, আমি সাংস্কৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম । তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব ।

ভব । সন্তানদিগকে ? কেন, মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্ধা রাখে কি ?

সত্য । হাঁ, আর একটি নূতন লোক । পূর্বে আমি তাহাকে কখন দেখি নাই । আজি নূতন আমার কাছে আসিয়াছে । সে অতি তরুণবয়স্ক যুবা পুরুষ । আমি তাহার আকারেঙ্গিতে ও কথা বার্তায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি । খাঁটা সোণা বলিয়া তাহাকে বোধ হইয়াছে । তাহাকে সন্তানের কার্য শিক্ষা করাইবার ভার জীবানন্দের প্রতি রহিল । কেন না জীবানন্দ লোকের চিত্তাকর্ষণে বড় সুদক্ষ । আমি চলিলাম, তোমাদের প্রতি আমার একটী উপদেশ বাকি আছে । অতিশয় মনঃসংযোগপূর্বক তাহা শ্রবণ কর ।

তখন উভয়ে যুক্ত-কর হইয়া নিবেদন করিলেন, “আজ্ঞা করুন ।”

সত্যানন্দ বলিলেন, “তোমরা দুইজনে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্বে কর, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না । আমি আসিলে প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্তব্য হইবে ।”

এই বলিয়া সত্যানন্দ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । ভবানন্দ এবং জীবানন্দ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাষি করিলেন ।

ভবানন্দ বলিলেন, “তোমার উপর না কি ?”

জীবা । বোধ হয় । ভগিনীর বাড়ীতে মহেন্দ্রের কন্যা রাখিতে গিয়াছিলাম ।

ভব । তাতে দোষ কি, সেটা ত নিষিদ্ধ নহে । ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ কি ?

জীবা । বোধ হয় গুরুদেব তাই মনে করেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সায়াকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন,

“তোমার কন্যা জীবিত আছে ।”

মহে । কোথায় মহারাজ ?

সত্য । তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন ?

মহে । সকলেই বলে তাই । মঠের অধিকারীদিগকে রাজা সম্বোধন করিতে হয় । আমার কন্যা কোথায় মহারাজ !

সত্য । তা শুনিবার আগে, একটা কথার স্বরূপ উত্তর দাও । তুমি সন্তানধর্ম গ্রহণ করিবে ?

মহে । তাহা নিশ্চিত মনে মনে স্থির করিয়াছি ।

সত্য । তবে কন্যা কোথায় শুনিতে চাহিও না ।

মহে । কেন মহারাজ !

সত্য । যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজনবর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই । স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে । যত দিন না সন্তানের মানস সিদ্ধ হয়, তত দিন, তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না । অতএব যদি সন্তানধর্ম গ্রহণ স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে ? দেখিতে ত পাইবে না ।

মহে । এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু ?

সত্য । সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ । যে সর্ব-ত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে । মারারঞ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাধা ঘুড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না ।

মহে । মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না । যে স্ত্রীপুত্রের মুখ দর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্যের অধিকারী নহে ?

সত্য । পুত্র কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই । সন্তানধর্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ বরিতে হইবে । তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে ?

মহে । তাহা না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব ?

সত্য । না ভুলিতে পার এ ব্রত গ্রহণ করিও না ।

মহে । সন্তান মাত্রেই কি এইরূপ পুত্র কলত্রকে বিস্মৃত

হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে? তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প!

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুণ্ঠের ভাগ বা অগ্নি পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত তাহারা সর্ক-ত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না, যুদ্ধের জন্ত লাঠি সড়কী-ওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্যে অধিকারী হইবে না।

মহে। দীক্ষা কি? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন? আমি ত ইতিপূর্বেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করিব কি প্রকারে?

সত্য। আমি সে পদ্ধতি বলিয়া দিতেছি।

মহে। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম-ধর্ম।

সত্য। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ ছুষ্ঠের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা। দশ বার

শরীর ধাত্বিককরিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন । কেশী, হিরণ্যকশিপুল, “অধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন । তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবী উদ্ধারকর্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা । চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে—উহা অন্ধক ধর্ম মাত্র । চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্তশক্তিময় । চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময় । আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অন্ধক বৈষ্ণব । কথাটা বুঝিলে ?

মহে । না । এ যে কেমন নূতন নূতন কথা শুনি-তেছি । কাশিমবাজারে একটা পাদারির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল—সে ঐ রকম কথা সকল বলিল—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়—তোমরা যীশুকে প্রেম কর--এ যে সেই রকম কথা ।

সত্য । যে রকম কথা আমরািগের চতুর্দশ পুরুষ বুঝিয়া আসিতেছেন, সেই রকম কথায় আমি তোমায় বুঝাইতেছি । ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক তাহা শুনিয়াছ ?

মহে । হাঁ । সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ ।

সত্য । ভাল । এই তিনটি গুণের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা । সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি, তাঁহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে । চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে । আর রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি ; ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা—দেবদেবীদিগের নিধন দ্বারা—

আমরা তাহা করি। আর তমোগুণ হইতে ভগান্ শরীরী—
চতুর্ভূজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন এক চন্দনাদি
উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিগেন্—সর্বসাধারণে
তাহা করে। এখন বুঝিলে?

মহে। বুঝিলাম। সন্তানেরা তবে উপাসকসম্প্রদায়
মাত্র ?

সত্য। তাই। আমরা রাজ্য চাহি না—কেবল মুসল-
মানেরা ভগবানের বিদেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত
করিতে চাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সত্যানন্দ কথাধাত্তা সমাপনান্তে মহেশ্বের সহিত সেই
মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব শোভাময় প্রকা
ণ্ডাকার চতুর্ভূজমূর্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন।
সেখানে তখন অপূর্ব শোভা। রজত, স্বর্ণ ও রত্নে রঞ্জিত বহু-
বিধ প্রদীপে, মন্দির আলোকিত হইয়াছে। রাশি রাশি পুষ্প
স্তূপাকারে শোভা করিয়া মন্দির আমোদিত করিতেছিল।
মন্দিরে আর একজন উপবেশন করিয়া মৃহ মৃহ “হরে মুরারে”
শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র
সে গাত্রোথান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা
করিলেন,

“তুমি দীক্ষিত হইবে ?”

সে বলিল, “আমাকে দয়া করুন ।”

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, “তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত, এবং অনশন আছ ত ?”

উত্তর । আছি ।

সত্য । তোমরা এই ভগবৎসাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর । সন্তান-ধর্মের নিয়ম সকল পালন করিবে ?

উভয়ে । করিব ।

সত্য । যত দিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করিবে ?

উভ । করিব ।

সত্য । মাতা পিতা ত্যাগ করিবে ?

উভ । করিব ।

সত্য । ভ্রাতা ভগিনী ?

উভ । ত্যাগ করিব ।

সত্য । দারাসুত ?

উভ । ত্যাগ করিব ।

সত্য । আত্মীয় স্বজন ? দাস দাসী ?

উভ । সকলই ত্যাগ করিলাম ।

সত্য । ধন—সম্পদ—ভোগ ?

উভ । সকলই পরিত্যাজ্য হইল ।

সত্য । ইন্দ্রিয় জয় করিবে ? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না ?

উভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্য। ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জ্ঞনা বা স্বজনের জ্ঞনা অর্থোপার্জন করিবে না? যাহা উপার্জন করিবে তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?

উভ। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্মের জ্ঞনা স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। রণে কখন ভঙ্গ দিবে না?

উভ। না।

সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?

উভ। জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জানি। অপরটা কি জাতি?

অপর ব্যক্তি বলিল “আমি ব্রাহ্মণকুমার।”

সত্য। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভ। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি বিনাশহেতু, যিনি সর্বাস্তুর্য্যামী, সর্বজয়ী,

সর্বশক্তিমান্ ও সর্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্ড্রের বজ্রে ও মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন ।

উভ । তথাস্তু ।

সত্য । তোমরা গাও “বন্দে মাতরম্ ।”

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দির মধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল ।
ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

দীক্ষা সমাপনান্তে সত্যানন্দ, মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন । উভয়ে উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন,

“দেখ বৎস ! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান্ আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি । তোমার দ্বারা মাব মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে । তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর । তোমাকে জীবানন্দ, ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলি না । তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও । স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতে হইবে ।”

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন । কিছু বলিলেন না । ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, “এক্ষণে আমাদের আশ্রয়

নাই, এমন স্থান নাই যে প্রবল সেনা আসিয়া আমাদেরকে অবরোধ করিলে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশদিন নির্ঝিল্লি থাকিব। আমাদের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকার। আমার ইচ্ছা সেইখানে একটা গড় প্রস্তুত করি। পরিখা প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে, আর বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদের দ্বারা গড় ঘাঁটির বাঁধ এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহ নির্মিত এক ঘর প্রস্তুত করাইবে। সেখানে সন্তানদের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। স্বর্ণে পূর্ণ সিন্দুক সকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সেই সকল অর্থের দ্বারা এই সকল কার্য্য নির্বাহ করিবে। আর আমি নানা স্থান হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পী সকল আনাইয়াছি। শিল্পী সকল আসিলে তুমি পদচিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান গোলা বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এইজন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।”

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইলেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

মহেন্দ্র সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, ঠাঁহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য সেই দিন দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন । সত্যানন্দ আশীর্বাদ করিয়া কৃষ্ণাজিনের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন । পরে অত্যাণ্ড মিষ্ট কথার পর বলিলেন, “কেমন, কৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে কি না ?”

শিষ্য বলিল, “কি প্রকারে বলিব ? আমি যাহাকে ভক্তি মনে করি, হয় ত সে ভণ্ডামি, নয় ত আত্ম-প্রতারণা ।”

সত্যানন্দ সম্বৃত্ত হইয়া বলিলেন, “ভাল বিবেচনা করিয়াছ । যাহাতে ভক্তি দিন দিন প্রগাঢ় হয়, সেই অনুষ্ঠান করিও । আমি আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার যত্ন সফল হইবে । কেন না তুমি বয়সে অতি নবীন । বৎস, তোমার কি বলিয়া ডাকিব, তাহা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই ।”

নূতন সন্তান বলিল, “আপনার যাহা অভিরুচি, আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস ।”

সত্য । তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমার নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে—অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর । কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্বে কি নাম ছিল ? যদি বলিতে কোন বাধা থাকে, তথাপি বলিও । আমার

কাছে বলিলে কর্ণান্তরে প্রবেশ করিবে না। সন্তান-ধর্মের মর্ম এই—যে, যাহা অবাচ্য, তাহাও গুরুর নিকট বলিতে হয়। বলিলে কোন ক্ষতি হয় না।

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, শিষ্যের কাল কুচকুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল।

সত্যানন্দ বলিলেন,

“ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা—আর যদি আমাকেই ঠকাবে ত এ বয়সে দেড় হাত দাড়ি কেন? আর দাড়ি খাট করিলেও কণ্ঠের স্বর—ও চখের চাহনি, কি লুকাতে পার? যদি এমন নির্কোঁধই হইতাম, তবে কি এত কাজে হাত দিতাম?”

শান্তি পোড়ারমুখী, তখন ছই চোক ঢাকা দিয়া কিছুক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বুড়োর মুখের উপর বিলোল কটাক্ষ নিরূপ করিয়া, বলিল “প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি। স্ত্রী-বাহতে কি কখন বল থাকে না?”

সত্য। গোপ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল আপনি কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, এক ইম্পাতের ধুক, আর লোহার

কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে “এই ইম্পাতের ধনুকে এই লোহার তারের গুণ দিতে হয়। গুণেব। পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয় তাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে সেই প্রকৃত বলবান্।”

শান্তি ধনুক ও তীর উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল “সকল সম্ভান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে ?”

সত্য। না, ইহা দ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই ?

সত্য। চারি জন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে ?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। এক জন আমি।

শান্তি। আর ?

সত্য। জীবানন্দ। ভবানন্দ। জ্ঞানানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।
কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, “একি ; তুমি দেবী না মানবী ?”

শান্তি করযোড়ে বলিল, “আমি সামান্য মানবী। কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।”

সত্য। তাই বা কিসে ? তুমি কি বালবিধবা ? না বাল-
বিধবারও এত বল হয় না, কেন না তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা।

সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্ভিষ্ট ?

শান্তি। উদ্ভিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি।

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের গায় শ্রুতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, “মনে পড়িয়াছে, জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী?”

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। যেন কতক-
গুলি হাতীর শুঁড়, রাজীবরাজির উপর পড়িল। সত্যানন্দ
বলিতে লাগিলেন “কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?”

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নত মুখে
বলিল,

“পাপাচরণ কি প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে
কি পাপাচরণ? সন্তানধর্মশাস্ত্র যদি একে পাপাচরণ বলে,
তবে সন্তানধর্ম অধর্ম। আমি তাঁহার সহধর্মিণী, তিনি ধর্ম্যা-
চরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্যাচরণ করিতে আসি-
য়াছি।”

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, উন্নত গ্রীবা, স্ফীত বক্ষ,
কম্পিত অধর এবং উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লুত চক্ষু দেখিয়া সত্যানন্দ
প্রীত হইলেন। বলিলেন,

“তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখ মা—পত্নী কেবল গৃহধর্ম্মেই
সহধর্ম্মিণী—বীরধর্ম্মে রমণী কি?”

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া, বীর হইয়াছেন?
রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন? অর্জুনের কতকগুলি
বিবাহ গণনা করুন দেখি? ভীমের যত বল ততগুলি পত্নী।
কত বলিব? আপনাকে বলিতেই বা কেন হইবে?

সত্য । কথা সত্য, কিন্তু রণক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে ?

শান্তি । অর্জুন যখন যাদবীসেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল ? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুদ্ধিত ?

সত্য । তা হউক, সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্যে বিরত করে । এইজন্য সন্তানের ব্রতই এই, যে রমণী জাতির সঙ্গে, একাসনে উপবেশন করিবে না । জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত । তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ ।

শান্তি । আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি । আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব । আমি কেবল ধর্মাচরণের জন্ত আসিয়াছি ; স্বামি-দর্শনের জন্ত নয় । বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই । স্বামী যে ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন আমি, তাহার ভাগিনী কেন হইব না ? তাই আসিয়াছি ।

সত্য । ভাল, তোমায় দিন কত পরীক্ষা করিয়া দেখি ।

শান্তি বলিলেন, “আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি ?”

সত্য । আজ আর কোথা যাইবে ?

শান্তি । তার পর ?

সত্য । মা ভবানীর মত তোমারও ললাটে আগুন আছে, সন্তানসম্প্রদায় কেন দাহ করিবে ? এই বলিয়া পরে আশীর্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করিলেন ।

শান্তি মনে মনে বলিল “র বেটা বুড়ো! আমার কপালে
আগুন! আমি পোড়াকপালি না, তোর মা পোড়াকপালি?”

বস্তুত সত্যানন্দের সে অভিপ্রায় নহে—চক্ষের বিছাতের
কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু তা কি বুড়ো বয়সে ছেলে
মানুষকে বলা যায়?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।
অতএব ঘর খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক ঘর খালি পড়িয়া
আছে। গোবর্দ্ধন নামে একজন পরিচারক—সেও ক্ষুদ্র-
দরের সন্তান—প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে
লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না। হতাশ হইয়া
গোবর্দ্ধন ফিরিয়া সত্যানন্দের কাছে শান্তিকে লইয়া চলিল।
শান্তি বলিল,

“ভাই সন্তান, এই দিকে যে কয়টা ঘর রহিল, এতেই দেখা
হইল না?”

গোবর্দ্ধন বলিল, “ও সব খুব ভাল ঘর বটে, কিন্তু ও
সকলে লোক আছে।”

শান্তি। কারা আছে?

গোব। বড় বড় সেনাপতি আছে।

শান্তি । বড় বড় সেনাপতি কে ?

গোব । ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ । আনন্দ-
মঠ আনন্দময় ।

শান্তি । ঘরগুলো দেখি চল না ।

গোবর্দ্ধন শান্তিকে প্রথমে ধীরানন্দের ঘরে লইয়া গেল ।
ধীরানন্দ মহাভারতের দ্রোণপর্ক পড়িতেছিলেন । অভিমত্যা
কি প্রকারে সপ্তরথীব সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই মন
নিবিষ্ট—তিনি কথা কহিলেন না । শান্তি সেখান হইতে
বিনা বাক্যবয়ে চলিয়া গেল ।

শান্তি পরে ভবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল । ভবানন্দ
তখন উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন । কাহার
মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখখানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ কুঞ্চিত
সুগন্ধি অলকারাশি আকর্ণপ্রসারিক্রয়ুগের উপর পড়িয়া
আছে । মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাটদেশ মৃত্যুর করাল
কাল ছায়ার গাহমান হইয়াছে । যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয়
দ্বন্দ্ব করিতেছে । নয়ন মুদ্রিত, জয়ুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড
পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে ।
তার পর যেমন করিয়া, শরনোধ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে
মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া, আপনার সৌন্দর্য্য বিকশিত করে,
যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃত মেঘমালাকে ক্রমে
ক্রমে স্তবগীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিগ্ভ্রমল আলো-
কিত করে, স্থল জল কীটপতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই
শবদেহে জীবনের শোভার সঞ্চার হইতেছিল । আহা কি
শোভা ! ভবানন্দ তাই ভাবিতেছিল, সেও কথা কহিল না ।

কল্যাণীর রূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল, শান্তির রূপের উপর সে দৃষ্টিপাত করিল না।

শান্তি তখন গৃহান্তরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, “এটা কার ঘর?”
গোবর্দ্ধন বলিল “জীবানন্দ ঠাকুরের।”

শান্তি। সে আবার কে? কৈ কেউতো এখানে নেই।

গোব। কোথায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন।

শান্তি। এই ঘরটি সকলের ভাল।

গোব। তা এ ঘরটা ত হবে না।

শান্তি। কেন?

গোব। জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি। তিনি না হয় আর একটা ঘর খুঁজে নিন্।

গোব। তা কি হয়? যিনি এ ঘরে আছেন, তিনি কর্তা বলেই হয়, যা করেন তাই হয়।

শান্তি। আচ্ছা তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছ-তলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কুঞ্জাজিন বিস্তারণ পূর্বক, প্রদীপটী উজ্জ্বল করিয়া লইয়া, জীবানন্দের একখানি পুথি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তির পুরুষবেশ, তথাপি দেখিবামাত্র জীবানন্দ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, “এ কি এ? শান্তি?”

শান্তি ধীরে ধীরে পুথিখানি রাখিয়া জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া বলিল,

“শান্তি কে মহাশয় ?”

জীবানন্দ অবাক—শেষ বলিলেন, “শান্তি কে মহাশয় ?
কেন তুমি শান্তি নও ?”

শান্তি ঘৃণার সহিত বলিল, “আমি নবীনানন্দ গোস্বামী ।”
এই কথা বলিয়া সে আবার পুথি পড়িতে মন দিল ।

জীবানন্দ উচ্চ হাস্য করিলেন ; বলিলেন, “এ নূতন রঙ্গ
বটে । তাব পর নবীনানন্দ, এখানে কি মনে ক’রে এসেছ ?”

শান্তি বলিল, “ভদ্রলোকের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত
আছে, যে প্রথম আলাপে ‘আপনি’ ‘মহাশয়’ ইত্যাদি সম্বোধন
করিতে হয় । আমিও আপনাকে অসম্মান করিয়া কথা
কহিতেছি না,—তবে আপনি কেন, আমাকে তুমি তুমি
করিতেছেন ?”

“যে আক্ষে” বলিয়া জীবানন্দ গলায় কাপড় দিয়া যোড
হাত করিয়া বলিল, “এক্ষণে বিনীতভাবে ভৃত্যের নিবেদন,
কি জ্ঞান ভরুইপুর হইতে, এ দীনভবনে মহাশয়ের শুভাগমন
হইয়াছে, আজ্ঞা করুন ।”

শান্তি অতি গম্ভীরভাবে বলিল, “ব্যঙ্গেরও প্রয়োজন
দেখিতেছি না । ভরুইপুর আমি চিনি না । আমি সম্মানধর্ম
গ্রহণ করিতে আসিয়া, আজ দীক্ষিত হইয়াছি ।”

জী । আ সর্কনাশ ! সত্য না কি ?

শা । সর্কনাশ কেন ? আপনিও দীক্ষিত ।

জী । তুমি যে জ্বীলোক !

শা । সে কি ? এমন কথা কোথা পাইলেন ?

জী । আমার বিশ্বাস ছিল আমার ব্রাহ্মণী জ্বীজাতীয় ।

শা। ব্রাহ্মণী ? আছে না কি ?

জী। ছিল ত জানি ।

শা। আপনার বিশ্বাস যে আমি আপনার ব্রাহ্মণী ?

জীবানন্দ আবার ঘোড় হাত করিয়া গলায় কাপড় দিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল, “অজ্ঞা হাঁ মহাশয় !”

শা। যদি এমন হাসির কথা আপনার মনে উদয় হইয়া থাকে, তবে আপনার কর্তব্য কি বলুন দেখি ?

জী। “আপনার গাত্রাবরণখানি বলপূর্বক গ্রহণান্তর অধর সুধা পান ।”

শা। “এ আপনার ছুষ্টবুদ্ধি অথবা গঞ্জিকার প্রতি অসাধারণ ভক্তির পরিচয় মাত্র। আপনি দীক্ষাকালে শপথ করিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবেন না। যদি আমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে—এমন সর্পে রজ্জু ভ্রম অনেকেরই হয়—তবে আপনার উচিত যে পৃথক্ আসনে উপবেশন করেন। আমার সঙ্গে আপনার আলাপও অকর্তব্য ।”

এই বলিয়া শান্তি পুনরপি পুস্তকে মন দিল। পরাস্ত হইয়া জীবানন্দ পৃথক্ শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিলেন।



ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ।





তৃতীয় খণ্ড ।

১১
প্রথম পরিচ্ছেদ ।

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বর কৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে,—কত কোটী তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্ভিক্ষের নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর স্মৃপ্রসন্ন হইলেন। স্মৃষ্টি হইল, পৃথিবী শশ্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা প্লেট ভরিয়া থাইল। অনেকে অনাহারে বা অন্নাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শশ্যশালিনী, কিন্তু জনশূন্য। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া পশুগণের বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ধ্বভূমিখণ্ড সকল অকর্ষিত, অমুৎপাদক হইয়া

আনন্দ মঠ।

অথবা জঙ্গলে পুরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলে পূর্ণ
হাস্যময় শ্রামল শস্যরাশি বিরাজ করিত,
গো মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল
যুবক যুবতীর প্রমোদ ভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে
হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর,
তিন বৎসর গেল। জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যে স্থান মনুষ্যের
স্থান ছিল সেখানে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র আসিয়া
সংসারাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে
সুন্দরীর দল অলঙ্কারিতচরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে
করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চ হাসি
হাসিতে হাসিতে যাইত, সেই খানে ঐ যুদ্ধে বিবর প্রস্তুত
করিয়া শাবকাদি লালন পালন করিতে লাগিল। যেখানে
শিশু সকল নবীন বয়সে সন্ধ্যাকালের মল্লিকাকুসুমতুল্য উৎফুল্ল
হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেই খানে আজি যুখে
যুখে বহুহস্তী সকল মদমত্ত হইয়া, বৃক্ষের কাণ্ডসকল বিদীর্ণ
করিতে লাগিল। যেখানে দুর্গোৎসব হইত, সেখানে শৃগা-
লের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিবে বিষধর
সর্প সকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য
জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রয় জন্মে, কিনিবার লোক
নাই; চাষায় চাষ করে টাকা পায় না, জমিদারের খাজনা
দিতে পারে না; জমীদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না।
রাজা জমীদারী কাড়িয়া লওয়ার জমীদার সম্প্রদায় সর্ব্বহত
হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী বহুপ্রসবিনী হইলেন
তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে

যাহার পার কাড়িয়া খায় । চোর ডাকাতেরা মাথা তুলিল,
সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল ।

এ দিকে সন্তান সম্প্রদায় নিত্য সচন্দন তুলসীদলে বিষ্ণু-
পাদপদ্ম পূজা করে, যার ঘরে বন্দুক পিস্তল আছে কাড়িয়া
আনে । ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন, “ভাই । যদি এক
দিকে এক ঘর মণিমাণিক্য হীরক প্রবালাদি দেখ আর এক
দিকে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দেখ, মণি মাণিক্য হীরক
প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটী লইয়া আসিবে ।”

তার পর, তাহারা গ্রামে গ্রামে চব পাঠাইতে লাগিল ।
চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে ভাই বিষ্ণুপূজা
করবি? এই বলিয়া ২০।২৫ জন জড় করিয়া মুসলমানের
গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয় । মুসল-
মানেরা প্রাণরক্ষায় ব্যতিবাস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্বস্ব
লুণ্ঠ করিয়া নূতন বিষ্ণু ভক্তদিগকে বিতরণ করে । লুণ্ঠের ভাগ
পাইয়া গ্রাম্য লোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্র-
হের পাদস্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে । লোকে
দেখিল সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে । বিশেষ মুসলমান-
রাজ্যের অরাজকতার ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর
বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল । হিন্দুধর্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই
হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্ত আগ্রহচিত্ত ছিল । অতএব দিনে দিনে
সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । দিনে দিনে শত শত, মাসে
মাসে সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ জীবানন্দের পাদ-
পদ্মে প্রণাম করিয়া দলবদ্ধ হইয়া দিগ্দিগন্তরে মুসলমানকে
শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল । যেখানে রাজপুরুষ

পায়, ধরিয়া মারপিট করে, কখন কখন প্রাণ বধ করে, যেখানে সরকারী টাকা পায়, লুটিয়া লইয়া ঘরে আনে, যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায়, দণ্ড করিয়া ভস্মাবশেষ করে। স্থানীয় রাজপুরুষগণ তখন, সন্তানদিগের শাসনার্থে ভূরি ভূরি সৈন্ত প্রেরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ শস্ত্রযুক্ত এবং মহাদস্তশালী। তাহাদিগের দর্পের সম্মুখে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। যদি অগ্রসর হয়, অমিতবলে সন্তানেরা তাহাদিগের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে। যদি কখনও কোন সন্তানের দলকে ববনসৈনিকেরা পরাস্ত করে, তখনই আর এক দল সন্তান কোথা হইতে আসিয়া বিজেতাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে চলিয়া যায়। এই সময়ে প্রথিতনামা ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য্য ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্নর জেনেরল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার শিকল গড়িয়া তিনি মনে মনে বিচার করিলেন, যে এই শিকলে আমি সদ্বীপা সমাগরা ভারত-ভূমিকে বাঁধিব; একদিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহ বলিয়াছিলেন তথাস্ত। কিন্তু সে দিন এখন দূরে। আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারেন হেষ্টিংসও বিকম্পিত হইলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথমে ফৌজদারী সৈন্তের দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমনি অবস্থা হইয়াছিল যে তাহারা কোন বৃদ্ধাস্ত্রীলোকের মুখেও হরি নাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায়

দেখিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস কাপ্তেন টমাস নামক একজন সুদক্ষ মৈনিককে অবিনায়ক করিয়া এক দল কোম্পানির সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণ জন্য প্রেবণ করিলেন ।

কাপ্তেন টমাস পৌছিয়া বিদ্রোহ নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । রাজার সৈন্য ও জমীদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া কোম্পানির সুশিক্ষিত সদস্যযুক্ত অত্যন্ত বনিষ্ঠ দেশী বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন । পরে সেই মিলিত সৈন্য দলে দলে বিভক্ত করিয়া সে সকলের আধিপত্য উপযুক্ত বোদ্ধ্বর্গকে নিযুক্ত করিলেন । পরে সেই সকল বোদ্ধ্বর্গকে দেশ ভাগ করিয়া দিলেন ; বলিয়া দিলেন তুমি অমুক প্রদেশে জেলিয়ার মত জাল দিয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যাইবে । যেখানে বিদ্রোহী দেখিবে পিপীলিকার মত তাহার প্রাণ সংহার করিবে । কোম্পানির মৈনিকেরা কেহ গাঁজা কেহ রম মারিয়া বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া সন্তানবধে ধাবিত হইল । কিন্তু সন্তানেরা এখন অনাথ্য অজের, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাবার কাপ্তেনের নিকট শস্ত্রের মত কণ্ঠিত হইতে লাগিল । হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তখন কোম্পানির অনেক রেশমের কুঠি ছিল। শিব-গ্রামে ঐরূপ এক কুঠি ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠির ফাক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠি সকলের রক্ষার জন্ত সুব্যবস্থা ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই জন্ত কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ংও সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস সাহেব দুই চারিদল ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন কতক গুলা চোরাড়, হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, বুনো সন্তানদিগের উৎসাহ দেখিয়া পরজব্বাপহরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্তের জন্ত গাড়ী গাড়ী বোঝাই হইয়া, উত্তম ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম বাগ্দীর দল লোভ সঞ্চর। করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ী আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সিপাহীদের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই চারিটা গুলুঁতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭০০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ২:৫৩ জন মরিয়াছে আর

১২৩৩ জন আহত হইয়াছে । ৭ জন বন্দী হইয়াছে । কেবল শেষ কথাটী সত্য । কাপ্তেন টমাস, দ্বিতীয় ব্লেন্ডিম বা রসবাকের যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া গোঁপ দাড়ি চুমবাইয়া নির্ভয়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলেন । এবং ডনিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, আর কি, এক্ষণে বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে, তুমি স্ত্রী পুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস । ডনিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, “তা হইবে, আপনি দশদিন এখানে থাকুন, দেশ আর একটু স্থির হউক, স্ত্রী পুত্র লইয়া আসিব ।” ডনিওয়ার্থ সাহেবের ঘরে পালা মাটন সুরগী ছিল । পনীরও তাঁহার ঘরে অতি উত্তম ছিল । নামাবিধ বস্ত্রপক্ষী তাঁহার টেবিলের শোভা সম্পাদন করিত । শ্রমশ্রমান্ দাবুচৌটি দ্বিতীয় দ্রোপদী সূত্রাং বিনা বাক্যব্যয়ে কাপ্তেন টমাস সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।

এদিকে ভবানন্দ মনে মনে গর গর করিতেছে, ভাবিতেছে কবে এই কাপ্তেন টমাস সাহেব বাহাদুরের মাথাটী কাটিয়া, দ্বিতীয় সম্বরারি বলিয়া উপাধি ধারণ করিবে । ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন জন্ত আসিয়াছিল, সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই । কি প্রকারে বুঝিবে ? কাপ্তেন টমাসের সমসাময়িক ইংরেজেরাও তাহা জানিতেন না । তখন কেবল বিধাতার মনে মনেই এ কথা ছিল । ভবানন্দ ভাবিতেছিলেন এ অম্লের বংশ একদিনে নিপাত করিব, সকলে জমা হউক, একটু অসতর্ক হউক, আমরা এখন একটু তফাত থাকি । সূত্রাং তাহারা একটু তফাৎ রহিল । কাপ্তেন টমাস সাহেব নিকটক হইয়া দ্রোপদীর গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন ।

সাহেব বাহাদুর শিকাষ বড় ভাল বাসেন, মধ্যে মধ্যে শিবগ্রামের নিকটবর্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। এক দিন ডনিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অঝারোহণে কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস শিকাবে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে কি, টমাস সাহেব অসংসাহসিক, বলবীর্য্যে ইংরেজ-জাতির মধ্যেও অতুল্য। সেই বিনড়ি অরণ্যে ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুকাদিতে অতিশয় ভয়ানক। বহুদূর আসিয়া শিকারীরা আর যাইতে অস্বাকৃত হইল, বলিল ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না। ডনিওয়ার্থ সাহেবের সেই অরণ্যমধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের হাতে পড়িয়াছিলেন যে, তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস বলিলেন “তোমরা ফেরো, আমি ফিরিব না।” এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বস্তুতঃ অরণ্যমধ্যে পথ ছিল না। অথ প্রবেশ করিতে পারিল না। কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন? এক বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রক্ষুটিত ফুলকুম্বযুক্ত লতাগুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া ও কে? এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। প্রক্ষুটিত ফুল যেন সেই স্বর্গীয় বপুর সংসর্গে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে। কাপ্তেন টমাস সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সাহেব দেশীভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, “তুমি কে?”

সন্ন্যাসী বলিল, “আমি সন্ন্যাসী ।”

কাপ্তেন বলিলেন, “টুমি rebel ।”

সন্ন্যাসী । সে কি ?

কাপ্তেন । হামি টোমায় গুলি কড়িয়া মাড়িব ।

সন্ন্যাসী । মার ।

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কি না, এমন সময় বিছাড়েগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হঠতে বন্দুক কাড়িয়া লইল । সন্ন্যাসী বক্ষাবরণচর্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল । একটানে জটা খুলিয়া ফেলিল ; কাপ্তেন টমাস সাহেব দেখিলেন অপূর্ণ সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি । সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল, “সাহেব, আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না । তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু মোছলমানে মারামারি হইতেছে, তোমরা মাঝখানে কেন ? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও ।”

সাহেব । টুমি কে ?

শান্তি । দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী । ষাঁহাদের সঙ্গে লড়াই কবিতে আসিয়াছ তাঁহাদের কাহারও স্ত্রী ।

সাহেব । টুমি হামারা গোড়ে* ঠাকিব ?

শান্তি । কি ? তোমার উপপত্নী স্বরূপ ?

সাহেব । ইষ্ট্রির মট ঠাকিটে পাড়, লেকেন সাদি হইব না ।

শান্তি । আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে ; আমাদের

* ঘরে

ঘরে একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে ; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেবো, তুমি সেই কোটরে থাকবে? আমাদের বাগানে বেশ মর্তমান কলা হয়।

সাহেব। টুমি বড spirited woman আছে, তোমাড় courageএ হামি খুসি আছে। টুমি আমার গোড়ে চল। তোমাড় স্বামী যুড্ডে মড়িয়া যাইব। টখন তোমাড় কি হইব?

শান্তি। তবে তোমার আমার একটা কথা থাক। যুদ্ধ ত ছুদিন চারিদিনে হইবেই। যদি তুমি জেত তবে আমি তোমার উপপত্নী হইয়া থাকিব স্বীকার করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি। আর আমরা যদি জিত, তবে তুমি আসিয়া, আমাদের কোটরে বাঁদর সেজে কলা খাবে ত?

সাহেব। কলা খাইটে উটুম জিনিস। এখন আছে?

শান্তি। নে তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেতের সঙ্গেও কেউ কথা কয়!

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শান্তি সাহেবকে ত্যাগ করিয়া হরিণীর গায় ক্ষিপ্রচরণে
বনমধ্যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল । সাহেব কিছু গরে শুনিতে
পাইলেন স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইতেছে ।

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

আবার কোথায় সারঙ্গের মধুর নিক্রমে বাজিল তাই ;—

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

তাহার সঙ্গে পুষকণ্ঠ মিলিয়া গীত হইল—

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

তিন স্বরে এক হইয়া গানে বনের লতা সকল কাঁপাইয়া
তুলিল । শান্তি গাইতে গাইতে চলিল,—

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

জলেতে তুফান হয়েছে,

আমার নূতন তরী ভানুল স্থখে,

মাঝিতে হাল ধরেছে,

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

ভেসে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,

জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটিছে রাখিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !”

সারঙ্গেও ঐ বাজিতেছিল,

জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবে কে ?

হরে মুরারে ! হরে মুরারে !

যেখানে অতি নিবিড় বন, ভিতরে কি আছে বাহির হইতে একেবারে অদৃশ্য, শান্তি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিল। সেইখানে সেই শাখাপল্লবরাশির মধ্যে লুক্কায়িত একটি ক্ষুদ্র কুটার আছে। ডালের বাঁধন, পাতার ছাওয়া, কাটের মেজে, তার উপর মাটি ঢালা। তাহারই ভিতরে লতাদ্বার মোচন করিয়া শান্তি প্রবেশ করিল। সেখানে জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।

জীবানন্দ শান্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“এত দিনের পর জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে কি ?”

শান্তিও হাসিয়া উত্তর করিল, “নালা ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে ?”

জীবানন্দ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন,—“দেখ শান্তি ! এক দিন আমার ব্রতভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণ ত উৎসর্গই হইয়াছে। যে পাপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এতদিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন—”

শান্তি আর বলিতে না দিয়া বলিল, “আমি তোমার ধর্মপত্নী, সহধর্মিণী, ধর্মের সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ

করিয়া আসিয়াছি। দুইজন একত্র সেই ধর্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্মবৃদ্ধি করিব। ধর্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালেব জন্ম, এবং বিবাহ পরকালের জন্ম। ইহকালের জন্ম যে বিবাহ, মনে কর তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন? তুমি কি পাপ করিয়াছ? তোমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। কৈ কোন দিন ত একাসনে বসো? নাই। প্রায়শ্চিত্ত কেন? হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি তোমায় বীরব্রত শিখাইব?”

জীবানন্দ আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিলেন, “শিখাইলে ত!” শান্তি প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল, “আরও দেখ গোঁসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমার ভাল বাস, আমি তোমায় ভাল বাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে! বল “বন্দে মাতরম্।” তখন দুই জনে গলা মিলাইয়া “বন্দে মাতরম্” গায়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

ভবানন্দ গোস্বামী একদা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন । প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন । গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী ; সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নে এক একবার গলির ভিতর উকি মারেন মাত্র । তৎপরে অন্ধকারেরই অধিকার । গলির পাশের একটী দোতারা বাড়ীতে ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন । নিম্নতলে একটী ঘরে যেখানে অর্দ্ধবয়স্ক একটী স্ত্রীলোক পাক করিতেছিল, সেই খানে গিয়া ভবানন্দ মহাপ্রভু দর্শন দিলেন । স্ত্রীলোকটি অর্দ্ধবয়স্ক, মোটা সোটা, কালো কোলো ঠেঁটি পরা, কপালে উকি, সীমন্তপ্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে । ঠন্ ঠন্ করিয়া হাঁড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে, ফর্ ফর্ করিয়া অলকদামের কেশগুচ্ছ উড়িতেছে, গল্ গল্ করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তাব মুখভঙ্গীতে তাহার মাথার চূড়ার নানাপ্রকার টলুনি টালুনির বিকাশ হইতেছে । এমন সময় ভবানন্দ মহাপ্রভু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন :—

“ঠাকরুণ দিদি প্রাতঃপ্রণাম !”

ঠাকরুণ দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন । মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছা ছিল কিন্তু সুবিধা হইল না, কেন না স্ক্‌ড়ি হাত ।

নিষেকমসৃণ সেই চিকুরজাল—হায় ! তাহাতে পূজার সময় একটি বক ফুল পড়িয়াছিল !—বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন ; বস্ত্রাঞ্চল, তাহা ঢাকিতে সক্ষম হইল না, কেন না ঠাকুরগণী একখানি পাঁচহাত কাপড় পরিয়াছিলেন । সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরুভারপ্রণত উদরপ্রদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়াছিল, তার পর দুঃসহ ভারগ্রস্ত হৃদয়মণ্ডলেরও কিছু আবরু পর্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে । শেষে ঘাড়ে পৌঁছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল । কাণের উপর উঠিয়া বলিল আর যাইতে পারি না । অগত্যা পরম-ব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণী কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কাণের কাছে ধরিয়া রাখিলেন । এবং ভবিষ্যতে আট হাত কাপড় কিনিবার জন্য মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন, “কে গোঁসাই ঠাকুর ? এস এস ! আমায় আবার প্রাতঃপ্রণাম কেন ভাই ?”

ভব । তুমি ঠান্দিদি যে !

গৌরী । আদর ক’রে বল বলিয়া । তোমরা হলে গোঁসাই মানুষ, দেবতা ! তা করেছ করেছ, বেঁচে থাক । তা করিলেও করিতে পার, হাজার হোক আমি বয়সে বড় ।

এখন ভবানন্দের অপেক্ষা গৌরী দেবী মহাশয়া বছর পঁচিশের বড়, কিন্তু স্মৃচতুর ভবানন্দ উত্তর করিলেন, “সে কি ঠান্দিদি ! রসের মানুষ দেখে ঠান্দিদি বলি । নইলে যখন হিসাব হয়েছিল, তুমি আমায় চেয়ে ছয় বছরের ছোট হইয়াছিলে মনে নাই ? আমাদের বৈষ্ণবের সকল রকম আছে জান, আমায় মনে মনে ইচ্ছা মঠধারী ব্রহ্মচারীকে

বলিয়া তোমায় সাঙ্গা করে ফেলি। সেই কথাটাই বলতে এসেছি।”

গৌরী। সে কি কথা ছি! অমন কথা কি বলতে আছে! আমরা হলেম বিধবা।

ভব। তবে সাঙ্গা হবে না?

গৌরী। তা ভাই, যা জান তা কর। তোমরা হলে পণ্ডিত, আমরা মেয়ে মানুষ কি বুঝি? তা, কবে হবে?

ভবানন্দ অতি কষ্টে হাস্যসংবরণ করিয়া বলিলেন, “সেই ব্রহ্মচারীটার সঙ্গে একবার দেখা হইলেই হয়। আর—সে কেমন আছে?”

গৌরী বিষম হইল। মনে মনে সন্দেহ করিল সাঙ্গার কথাটা তবে বুঝি তামাসা। বলিল, “আছে আর কেমন, যেমন থাকে।”

ভবা। তুমি গিয়া একবার দেখিয়া আইস কেমন আছে, বলিয়া আইস, আমি আসিয়াছি একবার সাঙ্গাৎ করিব।

গৌরী দেবী তখন ভাতের কাটি ফেলিয়া, হাত ধুইয়া বড় বড় ধাপের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, দোতালার উপর উঠিতে লাগিল। একটা ঘরে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া এক অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্য্যেব উপর একটা ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে কূলপরিপ্লাবিনী প্রশন্নসলিলা বিপুল-জলকল্লোলিনী শ্রোতস্বতীর বক্ষের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কনের ছায়া আছে। নদীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তীরে কুমুদিত তরুকুল বায়ুভরে হেলিতেছে, ঘন পুষ্পভরে নমিতেছে, অটালিকাশ্রেণীও শোভিতেছে। তরণী-শ্রেণী-তাড়নে জল আন্দোলিত হইতেছে। কাল মধ্যাহ্ন, তবু

সেই কাদম্বিনীনিবিড় কালো ছায়ায় সকল শোভাই কালিমা-
ময় । এও তাই । সেই পূর্বের মত চারু চিকণ চঞ্চল নিবিড়
অলকদাম, পূর্বের মত সেই প্রশস্ত পরিপূর্ণ ললাটভূমে পূর্বমত
অতুল তুলিকালিখিত ক্রধনু, পূর্বের মত বিস্ফারিত সজল
উজ্জল কৃষ্ণতার বৃহচ্ছফু, তত কটাক্ষময় নয়, তত লোলতা
নাই, কিছু নম্র । অধরে তেমনি রাগরঙ্গ, হৃদয় তেমনি
স্বাসানুগামী পূর্ণতায় ঢল ঢল, বাহু তেমনি বনলতাছাপ্রাপ্য
কোমলতায়ুক্ত । কিন্তু আজ সে দীপ্তি নাই, সে উজ্জলতা
নাই, সে প্রথরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই, সে রস নাই ।
বলিতে কি, বুঝি সে যৌবন নাই । আছে কেবল সৌন্দর্য্য
আর সে মাধুর্য্য । নূতন হইয়াছে ধৈর্য্য গান্তীর্য্য । ইহাকে পূর্বে
দেখিলে মনে হইত, মনুষ্যালোকে অতুলনীয় সুন্দরী, এখন
দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী । ইহার
চারি পার্শ্বে দুই তিনখানা তুলটের পুথি পড়িয়া আছে ।
দেওয়ালের গায়ে হরিনামের মালা টাঙ্গান আছে, আর মধ্যে
মধ্যে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার পট, কালিয়দমন, নবনারী-
কুঞ্জর, বসুন্ধরন, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি ব্রজলীলার চিত্র রঞ্জিত
আছে । চিত্রগুলির নীচে লেখা আছে, “চিত্র না বিচিত্র ?”
সেই গৃহমধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিলেন ।

ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন কল্যাণি, শারীরিক
মঙ্গল ত ?”

কল্যাণী । এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না ? আমার
শারীরিক মঙ্গলে আপনারই কি ইষ্ট, আর আমারই বা কি ইষ্ট ?

ভব । যে বৃক্ষ রোপণ করে, সে তাহাতে নিত্য জল দেয় ।

গাছ বাড়িলেই তাহার সুখ । তোমার মৃত দেহে আমি
জীবন রোপণ করিয়াছিলাম, বাড়িতেছে কি না, জিজ্ঞাসা
করিব না কেন ?

ক । বিষবৃক্ষের কি ক্ষয় আছে ?

ভব । জীবন কি বিষ ?

ক । না হলে অমৃত ঢালিয়া আমি তাহা ধ্বংস করিতে
চাহিয়াছিলাম কেন ?

ভব । সে অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, সাহস
করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই । কে তোমার জীবন
বিষময় করিয়াছিল ?

কল্যাণী স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, “আমার জীবন কেহ
বিষময় করে নাই । জীবনই বিষময় । আমার জীবন বিষময়,
আপনার জীবন বিষময়, সকলের জীবন বিষময় ।”

ভব । সত্য কল্যাণি, আমার জীবন বিষময় । যে দিন
অবধি—তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে ?

ক । না ।

ভব । অভিধান ?

ক । ভাল লাগে না ।

ভব । বিদ্যা অর্জনে কিছু আগ্রহ দেখিয়াছিলাম । এখন
এ অশ্রদ্ধা কেন ?

ক । আপনার মত পণ্ডিতও যখন মহাপাপিষ্ঠ, তখন
লেখাপড়া না করাই ভাল । আমার স্বামীর সংবাদ কি প্রভু ?

ভব । বার বার সে সংবাদ কেন জিজ্ঞাসা কর ? তিনি
ত তোমার পক্ষে মৃত ।

ক। আমি তাঁর পক্ষে মৃত, তিনি আমার পক্ষে নন ।

ভব। তিনি তোমার পক্ষে মৃতবৎ হইবেন বলিয়াই ত
তুমি মরিলে । বার বার সে কথা কেন কল্যাণি ?

ক। মরিলে কি সম্বন্ধ যায় ? তিনি কেমন আছেন ?

ভব। ভাল আছেন ।

ক। কোথায় আছেন ? পদচিহ্নে ?

ভব। সেই খানেই আছেন ।

ক। কি কাজ করিতেছেন ?

ভব। যাহা করিতেছিলেন । দুর্গনির্মাণ, অস্ত্রনির্মাণ
তাঁহারই নির্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে ।
তাঁহার কল্যাণে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলি, বারুদের
আমাদের আর অভাব নাই । সন্তানমধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ।
তিনি আমাদের মহৎ উপকার করিতেছেন । তিনি আমা-
দিগের দক্ষিণ রাহু ।

ক। আমি প্রাণত্যাগ না করিলে কি এত হইত ? যার
বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে
পারে ? যার পায়ে লোহার শিকল সে কি দৌড়ায় ? কেন
সন্ন্যাসী তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে ?

ভব। স্ত্রী সহধর্মিণী, ধর্মের সহায় ।

ক। ছোট ছোট ধর্মের । বড় বড় ধর্মের কণ্টক । আমি
বিষকণ্টকের দ্বারা তাঁহার অধর্মকণ্টক উদ্ধৃত করিয়াছিলাম ।
ছি ! ছুরাচার পামর ব্রহ্মচারী ! এ প্রাণ তুমি ফিরিয়া দিলে
কেন ?

ভব। ভাল, যা দিয়াছি, তা না হয় আমারই আছে ।

কল্যাণি! যে প্রাণ তোমায় দিয়াছি, তাহা কি তুমি আমায় দিতে পার ?

ক। আপনি কিছু সংবাদ রাখেন কি, আমার স্নকুমারী কেমন আছে ?

ভব। অনেক দিন সে সংবাদ পাই নাই। জীবানন্দ অনেক দিন সে দিকে যান নাই।

ক। সে সংবাদ কি আমায় আনাইয়া দিতে পারেন না ? স্বামীই আমার ত্যাজ্য, বাঁচিলাম ত কন্যা কেন ত্যাগ করিব ? এখনও স্নকুমারীকে পাইলে এ জীবনে কিছু সুখ সম্ভাবিত হয়। কিন্তু আমার জন্ত আপনি কেন এত করিবেন ?

ভব। করিব কল্যাণি। তোমার কন্যা আনিয়া দিব। কিন্তু তার পর ?

ক। তার পর কি ঠাকুর ?

ভব। স্বামী ?

ক। ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিয়াছি।

ভব। যদি তার ব্রত সম্পূর্ণ হয় ?

ক। তবে তাঁরই হইব! আমি যে বাঁচিয়া আছি, তিনি কি জানেন ?

ভব। না।

ক। আপনার সঙ্গে কি তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না ?

ভব। হয়।

ক। আমার কথা কিছু বলেন না ?

ভব। না, যে স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে স্বামীর আর সম্বন্ধ কি ?

ক । কি বলিতেছেন ?

ভব । তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুন-
র্জন্ম হইয়াছে ।

ক । আমার কণ্ঠা আনিয়া দাও ।

ভব । দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার ।

ক । তোমার সঙ্গে নাকি ?

ভব । বিবাহ করিবে ?

ক । তোমার সঙ্গে নাকি ?

ভব । যদি তাই হয় ?

ক । সন্তানধর্ম কোথায় থাকিবে ?

ভব । অতল জলে ।

ক । পরকাল ?

ভব । অতল জলে ;

ক । এই মহাব্রত ।

ভব । অতল জলে ।

ক । কিসের জন্ত এ সব অতল জলে ডুবাইবে ?

ভব । তোমার জন্ত । দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন,
সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অবশ ; সন্তানধর্ম আমার
প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ ।
যে দিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে
আমি তোমার পদমূলে বিক্রীত । আমি জানিতাম না,
যে সংসারে এ রূপরাশি আছে । এমন রূপরাশি আমি
কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তানধর্ম গ্রহণ করিতাম
না । এ ধর্ম এ আগুনে পুড়িয়া ছাই হয় । ধর্ম পুড়িয়া

গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজি চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না! দাহ! কল্যাণী দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি, আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?

ক। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে সন্তানধর্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ কথা কি সত্য?

ভব। এ কথা সত্য।

ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু?

ভব। আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে?

ভব। নিশ্চিত মরিব।

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি?

ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত; কেন না আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে?

ভব। আগামী যুদ্ধে।

ক। তবে তুমি বিদায় হও। আমার কন্যা পাঠাইয়া দিবে কি?

ভবানন্দ সাক্ষরলোচনে বলিল, “দিব। আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি?”

কল্যাণী বলিল, “রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্মী বলিয়া মনে রাখিব।”

ভবানন্দ বিদায় হইল, কল্যাণী পুথি পড়িতে বসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

ভবানন্দ ভাবিতে ভাবিতে মঠে চলিলেন । যাইতে যাইতে রাত্রি হইল । পথে একাকী যাইতেছিলেন । বনমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, বনমধ্যে আর এক ব্যক্তি তাঁহার আগে আগে যাইতেছে । ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে হে যাও ?”

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, “জিজ্ঞাসা করিতে জানিলে উত্তর দিই—আমি পথিক ।”

ভব । “বন্দে ।”

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, “মাতরম্ ।”

ভব । আমি ভবানন্দ গোস্বামী ।

অগ্রগামী । আমি ধীরানন্দ ।

ভব । ধীরানন্দ, কোথায় গিয়াছিলে ?

ধীর । আপনারই সন্মানে ।

ভব । কেন ?

ধীর । একটা কথা বলিতে ।

ভব । কি কথা ?

ধীর । নিৰ্জনে বক্তব্য ।

ভব । এইখানেই বল না, এ অতি নিৰ্জন স্থান ।

ধীর । আপনি নগরে গিয়াছিলেন ?

ভব । হাঁ ।

ধীর । গৌরী দেবীর গৃহে ?

ভব । . তুমিও নগরে গিয়াছিলে না কি ?

ধীর । সেখানে একটি পরমসুন্দরী যুবতী বাস করে ?

ভবানন্দ কিছু বিস্মিত, কিছু ভীত হইলেন । বলিলেন
—“এসকল কি কথা ?”

ধীর । আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন ?

ভব । তার পর ?

ধীর । আপনি সেই কামিনীর প্রতি অতিশয় অমুরক্ত ।

ভব । (কিছু ভাবিয়া) ধীরানন্দ, কেন এত সম্মান লইলে ?
দেখ ধীরানন্দ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য । তুমি
ভিন্ন আর কয়জন এ কথা জানে ?

ধীর । আর কেহ না ।

ভব । তবে তোমাকে বধ করিলেই আমি কলঙ্ক হইতে
মুক্ত হইতে পারি ?

ধীর । পার ।

ভব । আইস তবে এই বিজন স্থানে দুই জনে যুদ্ধ করি ।
হয় তোমাকে বধ করিয়া আমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি
আমাকে বধ করিয়া আমার সকল জ্বালা নির্বাণ কর । অস্ত্র
আছে ?

ধীর । আছে—শুধু হাতে কার সাধ্য তোমার সঙ্গে এ
সকল কথা কয় । যুদ্ধই যদি তোমার মত হয়, তবে অবশ্য
করিব । সন্তানে সন্তানে বিরোধ নিষিদ্ধ । কিন্তু আত্মরক্ষায়
জন্য কাহারও সঙ্গে বিরোধ নিষিদ্ধ নহে । কিন্তু যাহা বলিবার
জন্য আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম, তাহা সবটা শুনিয়া যুদ্ধ
করিলে ভাল হয় না ?

ভব । ক্ষতি কি—বল না ।

ভবানন্দ তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া ধীরানন্দের স্বন্ধে স্থাপিত করিলেন । ধীরানন্দ না পলায় ।

ধীর । আমি এই বলিতেছিলাম ;—তুমি কল্যাণাকে বিবাহ কর—

ভব । কল্যাণী তাও জান ?

ধীর । বিবাহ কর না কেন ?

ভব । তাহার যে স্বামী আছে ।

ধীর । বৈষ্ণবের সেক্ষপ বিবাহ হয় ।

ভব । সে নেড়া বৈরাগীর—সন্তানের নহে । সন্তানের বিবাহই নাই ।

ধীর । সন্তান-ধর্ম কি অপরিহার্য—তোমার যে প্রাণ যায় । ছি ! ছি ! আমার কাঁধ যে কাটিয়া গেল ? (বাস্তবিক এবার ধীরানন্দের স্বন্ধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল ।)

ভব । তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্ম্যে মতি দিতে আসিয়াছ ? অবশ্য তোমার কোন স্বার্থ আছে ।

ধীর । তাহাও বলিবার ইচ্ছা আছে—তরবারি বসাইও না—বলিতেছি । এই সন্তানধর্ম্যে আমার হাড় জ্বব জ্বর হইয়াছে, আমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিয়া দিনপাত করিবার জন্ত বড় উতলা হইয়াছি । আমি এ সন্তানধর্ম্য পরিত্যাগ করিব । কিন্তু আমার কি বাড়ী গিয়া বসিবার যো আছে ? বিদ্রোহী বলিয়া আমাকে অনেকে চিনে । ঘরে গিয়া বসিলেই হয় রাজপুঙ্ঘে মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে, নয় সন্তানেরাই বিশ্বাসঘাতী বলিয়া মারিয়া

ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। এই জন্ত তোমাকে আমার পথে লইয়া যাইতে চাই।

ভব। কেন, আমায় কেন ?

ধীর। সেইটি আসল কথা। এই সন্তানেরা তোমার আজ্ঞাধীন—সত্যানন্দ এখন এখানে নাই, তুমি ইহার নায়ক। তুমি এই সেনা লইয়া যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধ জয় হইলে তুমি কেন স্বনামে রাজ্য স্থাপন কর না, সেনা ত তোমার আজ্ঞাকারী। তুমি রাজা হও—কল্যাণী তোমার মন্দোদরী হউক, আমি তোমার অনুচর হইয়া স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করি, আর আশীর্বাদ করি। সন্তানধর্ম অতল জলে ডুবাইয়া দাও।

ভবানন্দ, ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন। বলিলেন, "ধীরানন্দ যুদ্ধ কর, তোমায় বধ করিব। আমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া থাকিব, কিন্তু বিশ্বাসহস্তা নই। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হইতে পরামর্শ দিয়াছ। নিজেও বিশ্বাসঘাতক, তোমাকে মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় না। তোমাকে মারিব।" ধীরানন্দ, কথা শেষ হইতে না হইতেই উর্দ্ধ্বাঙ্গে পলায়ন করিল। ভবানন্দ তাহার পশ্চাদ্ভর্তী হইলেন না। ভবানন্দ কিছুক্ষণ অগ্ৰমনা ছিলেন, যখন খুঁজিলেন, তখন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মঠে না গিয়া ভবানন্দ গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই জঙ্গলমধ্যে এক স্থানে এক প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির উপর, লতাপুলকণ্টকাদি অতিশয় নিবিড় ভাবে জন্মিয়াছে। সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস। ভগ্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অভয় ও পরিত্রস্ত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভবানন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একেবারে জনশূন্য। অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষতলায় ছর্ভেদ্য, বন্যপশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল জনশূন্য, অন্ধকার ছর্ভেদ্য, নীরব! রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের ছঙ্কার অথবা অন্য স্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আক্ষালনের বিকট শব্দ। কদাচিত কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষকম্পন, কদাচিত তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী, পশুদিগের দ্রুতগমন শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকারে ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। তাঁহার পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই, অথবা কেবল ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছেন। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন; স্পন্দ নাই, নিশ্বাস নাই, ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে

বলিতেছিলেন, “যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্য হইবে। ১৫ মিনি ভাগীরথীজলতরঙ্গ সমীপে ক্ষুদ্র গজের মত ইন্দ্রিয়-হেঁচাতে ভাসিয়া গেলাম, ইহাই আমার দুঃখ। এক মুহূর্তে দেহের ধ্বংস হইতে পারে,—দেহের ধ্বংসেই ইন্দ্রিয়ের ধ্বংস—আমি সেই ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইলাম? আমার মরণ শ্রেয়। ধর্ম-ত্যাগী? ছি! মরিব!” এমন সময়ে পেচক মাথার উপর, গম্ভীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “ও কি শব্দ? কাণে যেন গেল যম আমায় ডাকিতেছে। আমি জানি না কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিল, কে আমায় বিধি দিল, কে মরিতে বলিল! পুণ্যময়ি অনন্তে! তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের তো মর্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমায় ধর্মের মতি দাও, আমার পাপ হইতে বিরত কর। ধর্মের, হে গুরুদেব! ধর্মের যেন আমার মতি থাকে!”

তখন সেই ভীষণ কাননমধ্য হইতে অতি মধুর অথচ গম্ভীর, মর্মভেদী মনুবার্ণ শব্দ হইল; কে বলিল, “ধর্মের তোমার মতি থাকিবে—আশীর্ব্বাদ করিলাম।”

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। “একি এ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ। মহারাজ কোথায় আপনি! এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন।”

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না—কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃপুনঃ ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। এদিক ও দিক খুঁজিলেন—কোথাও কেহ নাই।

যখন রজনী প্রভাতে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া বৃহৎ অরণ্যের শিরঃস্থ শ্যামল পত্ররাশিতে প্রতিভাসিত হইতেছিল, তখন

জীবানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । কর্ণে প্রবেশ করিল—“হরে মুরারে ! হরে মুরারে ।” চিনিলেন সত্যানন্দের কণ্ঠ । বুঝিলেন, প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

জীবানন্দ কুটার হইতে বাহির হইয়া গেলে পর, শান্তি-দেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু রবে গীত করিতে লাগিলেন ;—

“প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বাহিত্র চরিত্রনখেনং
কেশবধৃত মীনশরীর
জয় জগদীশ হরে !”

গোস্বামিবিরচিত মধুর স্তোত্র যখন শান্তিদেবীকণ্ঠনিঃসৃত হইয়া রাগ-তাল লয়-সম্পূর্ণ হইয়া সেই অনন্ত কাননের অনন্ত নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া, পূর্ণ জলোচ্ছ্বাসের সময়ে বসস্তানিল-ভাঙিত তরঙ্গভঙ্গের স্রাব মধুর হইয়া আসিল, তখন তিনি গায়িলেন ;—

“নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে !”

তখন বাহির হইতে কে অতি গম্ভীর রবে গায়িল, গম্ভীর
মেঘগর্জনবৎ তানে গায়িল ;—

লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং

ধুমকেতুমিব কিমপি করালং

কেশব ধৃতকঙ্কিণরীর

জয় জগদীশ হরে ।”

শান্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ
করিল, বলিল “প্রভো, আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি
যে আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই—আজ্ঞা করুন
আমাকে কি করিতে হইবে” বলিয়া সারঙ্গে সুর দিয়া শান্তি
আবার গায়িল,—

তব চরণপ্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।
সত্যানন্দ বলিলেন “মা তোমার কুশলই হইবে।”

শান্তি। কিসে ঠাকুর—তোমার তো আজ্ঞা আছে আমার
বৈধব্য!

সত্য। তোমাতে আমি চিনিতাম না। মা! দড়ির
ছোর না বুঝিয়া আমি জেরাদা টানিয়াছি তুমি আমার অপেক্ষা
জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে
আমি সকল জানি। তোমাব প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা
করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার
কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।

সেই বিশাল নীল উৎফুল্ল লোচনে নিদাঘকাদম্বিনী-
বিরাজিত বিছাতুল্য ঘোর রোধকটাক্ষ হইল। শান্তি বলিল,
“কি ঠাকুর! আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা, বাহা

যাহা তোমর সঙ্গে কথোপকথন হইল, সবই বলিব । মরিতে হয় তিনি মরিবেন, আমার ক্ষতি কি ? আমি তো সঙ্গে সঙ্গে মরিব । তাঁর স্বর্গ আছে, মনে কর কি আমার স্বর্গ নাই ?

ব্রহ্মচারী বলিলেন যে “আমি কখন হারি নাই, আজ তোমার কাছে হারিলাম । মা আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহ কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণরক্ষা কর, আমার কার্যোদ্ধার হইবে ।”

বিজ্ঞানী হাসিল । শান্তি বলিল “আমার স্বামীর ধর্ম আমার স্বামীর হাতে ; আমি তাঁহাকে ধর্ম হইতে বিরত করিবার কে ? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা, কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম দেবতা—আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম বড় । আমার ধর্ম আমার যে দিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি ; আমার স্বামীর ধর্ম জলাঞ্জলি দিব ? মহারাজ ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না ।”

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “মা, এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে । আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে । আমি মরিব, জীবানন্দ, ভবানন্দ, সবাই মরিবে, বোধ হয় মা তুমিও মরিবে ; কিন্তু দেখ কাজ করিয়া মরিতে হইবে, বিনা কার্যে কি মরা ভাল ?—আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি আর কাহাকেও মা বলি নাই, কেন না সেই সূজলা সূফলা ধরনী ভিন্ন আমরা অনন্তমাতৃক । আর তোমাকে মা বলিলাম, তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর,

ষাহাতে কার্যোদ্ধার হয় তাহা করিও, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করিও, তোমার প্রাণরক্ষা করিও।”

এই বলিয়া সত্যানন্দ “হরে মুরারে মধুকৈটভারে” গায়িত্তে গায়িত্তে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অন্তিম পরিচ্ছেদ ।

ক্রমে সন্তানসম্প্রদায়মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হইল যে সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তানসম্প্রদায় নদীতীরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা-রাত্রিতে নদীসৈকতপার্শ্বে বৃহৎ কানন মধ্যে আম্র, পনস, তাল, তিস্তিড়ী, অশ্বথ, বেল, বট, শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদিরঞ্জিত মহাগহনে দশ সহস্র সন্তান সমবেত হইল। তখন সকলেই পরস্পরের মুখে সত্যানন্দের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহা কোলাহলধ্বনি করিতে লাগিল। সত্যানন্দ কি জন্তু কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিত না। প্রবাদ এই যে, তিনি সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আজ সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল “মহারাজের তপঃসিদ্ধি হইয়াছে— আমাদের রাজ্য হইবে।” তখন বড় কোলাহল হইতে

লাগিল । কেহ চীৎকার করিতে লাগিল “মার, মার, নেড়ে
মাড় ।” কেহ বলিল “জয় জয় ! মহারাজকি জয় ।” কেহ
গায়িল “হরে মুরারে মধুকৈটভারে !” কেহ গায়িল “বন্দে
মাতরম্ !” কেহ বলে—ভাই এমন দিন কি হইবে, তুচ্ছ
বান্ধালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীরপাত করিব ?” কেহ বলে
“ভাই এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধানাথবের
মন্দির গড়িব ?” কেহ বলে “ভাই এমন দিন কি হইবে,
আপনার ধন আপনি খাইব ?” দশ সহস্র নরকণ্ঠের কল কল
রব, মধুর বায়ুনস্তাড়িত বৃক্ষপত্ররাশির মঙ্গর, সৈকতবাহিনী
তরঙ্গিণীর মৃচ্ মৃচ্ তর তর রব, নীল আকাশে চন্দ্র, তারা,
শ্বেত মেঘরাশি, শ্রামল ধরণীতলে হরিৎ কানন, স্বচ্ছ নদী,
শ্বেত সৈকত, ফুল কুমুদাম । আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্বজন-
মনোরম “বন্দে মাতরম্ ।” সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত
সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন । তখন সেই দশ সহস্র
সন্তানমস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদপতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া
শ্রামল তৃণভূমে প্রণত হইল । অতি উচ্চস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে
উভয় বাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন,

“শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, বননানী, বৈকুণ্ঠনাথ, যিনি কেশি-
মখন, মধুনুবনবকমর্দন, লোকপালন তিনি তোমাদের মঙ্গল
করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বন দিন, মনে ভক্তি দিন,
ধর্ম্মে মতি দিন, তোমরা একবার তাঁহার মহিমা গীত কর ।”
তখন সেই সহস্র কণ্ঠে উচ্চস্বরে গীত হইতে লাগিল,—

“জয় জগদীশ হরে !

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং

বিহিতবহিত্রচরিত্রমখণ্ডঃ

কেশব ধৃতমীনশরীর

জয় জগদীশ হরে !”

সত্যানন্দ তাহাদিগকে পুনরায় আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,
“হে সন্তানগণ তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা
আছে। টমাসনামা এক জন বিধর্মী ছুরাত্মা বহুতর সন্তান
নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্তে বধ
করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা—তোমরা কি বল ?”

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। “এখনই
মারিব—কোথায় তারা দেখাইয়া দিবে চল!” “মার! মার!
শত্রু মার!” ইত্যাদি শব্দ দূরস্থ শৈলে প্রতিধ্বনিত হইল।
তখন সত্যানন্দ বলিলেন, “সেজন্তু আমাদিগকে একটু ধৈর্য্যা-
বলম্বন করিতে হইবে। শত্রুদের কামান আছে—কামান
ব্যতীত তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষ তাহারা বড়
বীরজাতি। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টা কামান আসিতেছে—
কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ প্রভাত
হইতেছে—বেলা চারিদণ্ড হইলেই—ও কি ও—”

“গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্!” অকস্মাৎ চারি দিকে বিশাল
কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের।
জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাপ্তেন টমাস্ সন্তানসম্প্রদায়কে এই
আক্রমণে ঘিরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ ।

“গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।” ইংরেজের কামান ডাকিল। সেই শব্দ বিশাল কানন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, “গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।” নদীর বাঁধে বাঁধে ফিরিয়া সেই ধ্বনি দূরস্থ আকাশপ্রান্ত হইতে প্রতিক্ৰিষ্ট হইল “গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।” নদীপারে দূরস্থ কাননান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্বনি আবার ডাকিতে লাগিল “গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্! সত্যানন্দ আদেশ করিলেন, তোমরা দেখ কিসের তোপ। কয়েকজন সন্তান তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল, কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর গেলেই শ্রাবণের ধারার ঞায় গোলা তাহাদের উপর বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্ব-সহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন “উচ্চ বৃক্ষে উঠ, দেখ কি।” তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রভাতকিরণে দেখিতেছিলেন, তিনি বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে ডাকিয়া বলিলেন “তোপ ইংরেজের।” সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন “অশ্বারোহী না পদাতি?”

জীব। দুই আছে।

সত্যা। কত?

জীব। আন্দাজ করিতে পারিতেছি না, এখনও বনের আড়াল হইতে বাহির হইতেছে।

সত্যা । গোরা আছে ? না কেবল সিপাহী ।

জীবা । গোরা আছে ।

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন “তুমি গাছ হইতে নাম ।”

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিলেন ।

সত্যানন্দ বলিলেন ‘দশ হাজার সন্তান উপস্থিত আছে ; কি করিতে পার দেখ । তুমি আজ সেনাপতি ।’ জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উন্নতকনে অশ্বে আবোহণ করিলেন । একবার নবীনানন্দ গোয়ালীব প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নেজ্বিতে কি বলিলেন কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না । নবীনানন্দ নয়নেজ্বিতে কি উত্তর করিল তাহাও কেহ বুঝিল না, কেবল তারা ছইজনেই মনে মনে বুঝিল, যে হয় ত এ জন্মের মত এই বিদায় । তখন নবীনানন্দ দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সকলকে বলিলেন, “ভাই ! এই সময় গাও ‘জয় জগদীশ হরে !’ ” তখন সেই দশসহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদী কানন আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তোপের শব্দ ডুবাঁইয়া দিয়া সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল,

“জয় জগদীশ হরে

স্নেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্—”

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সন্তানসম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল । কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক ছিন্নবাহু ছিন্নহৃৎপিণ্ড হইয়া মর্জিতে পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধন করিল না, সকলে গায়িতে লাগিল, “জয় জগদীশ হরে !” গীত সমাপ্ত হইলে সকলেই একেবারে

নিস্ক্রম হইল। সেই নিবিড় কানন, সেই নদীসৈকত, সেই অনন্ত বিজন একেবারে গম্ভীর নীরবে নিবিষ্ট হইল; কেবল সেই অতি ভয়ানক কামানের ধ্বনি আর দূরশ্রুত গোরার সমবেত অস্ত্রের ঝঙ্কনা ও পদধ্বনি ।

তখন সত্যানন্দ সেই গম্ভীর নিস্ক্রমতা মধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিবেন—তোপ কতদূর ?”

উপর হইতে একজন বলিল “এই কাননের অতি নিকটে, একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র !”

সত্যানন্দ বলিলেন “কে তুমি ?”

উপর হইতে উত্তর হইল “আমি নবীনানন্দ ।”

তখন সত্যানন্দ বলিলেন “তোমরা দশ সহস্র সন্তান, আজ তোমাদেরই জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।” তখন অগ্র-বর্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিলেন “আইস ।”

সেই দশ সহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতি, অতিবেগে জীবানন্দের অনুবর্তী হইল। পদাতির স্কন্ধে বন্দুক, কটীতে তরবারি, হস্তে বল্লম। কানন হইতে নিস্ক্রান্ত হইবামাত্র, সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। বহুতর সন্তান বিনা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল। একজন জীবানন্দকে বলিল “জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণহত্যার কাজ কি।”

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন ভবানন্দ—জীবানন্দ উত্তর করিলেন “কি করিতে বল।”

ভব। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনা-

দিগের প্রাণ রক্ষা করি—তোপের মুখে, পরিষ্কার মাঠে, বিনা তোপে এ সম্ভানসৈন্য এক দণ্ড টিকিবে না; কিন্তু ঝোপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে ।

জীব । তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন তোপ কাড়িয়া লইতে হইবে, অতএব আমরা তোপ কাড়িয়া লইতে যাইব ।

ভব । কার সাধ্য তোপ কাড়ে ? কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও আমি যাইতেছি ।

জীব । তা হবে না—ভবানন্দ ! আজ আমার মরিবার দিন ।

ভ । আজ আমার মরিবার দিন ।

জীব । আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ।

ভব । তুমি নিষ্পাপশরীর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই । আমার চিত্ত কলুষিত—আমাকেই মরিতে হইবে—তুমি থাক, আমি যাই ।

জীব । ভবানন্দ ! তোমার কি পাপ তাহা আমি জানি না । কিন্তু তুমি থাকিলে সম্ভানের কার্যোদ্ধার হইবে । আমি যাই । ভবানন্দ নীরব হইয়া শেষে বলিলেন, “মরিবার প্রয়োজন হয় আজই মরিব, যে দিন মরিবার প্রয়োজন হইবে সেই দিন মরিব, মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কি ?”

জীব । তবে এসো ।

এই কথার পর ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্তী হইলেন । তখন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সম্ভানসৈন্য ধণ্ড বিধণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িয়া চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে,

তাহার উপর শত্রুর বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সন্তানদলকে ভূমে পাড়িয়া ফেলিতেছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিলেন “এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই? এই সময়ে গাও বন্দে মাতরম্!” তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্রকণ্ঠ সন্তান-সেনা তোপের তালে গায়িল “বন্দে মাতরম্।”

দশম পরিচ্ছেদ ।

সেই দশ সহস্র সন্তান “বন্দে মাতরম্” গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ড বিখণ্ড বিদীর্ণ উৎপতিত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তথাপি সন্তানসৈন্য ফেরে না। সেই সময়ে কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় একদল সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া প্রবলবেগে সন্তানদিগের দক্ষিণপার্শ্বে আক্রমণ করিল। তখন দুই দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্ত্তে শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন জীবানন্দ বলিলেন, “ভবানন্দ তোমারই কথা ঠিক, আর বৈষ্ণবধ্বংসের প্রয়োজন নাই; ধীরে ধীরে ফিরি।”

ভব। এখন ফিরিবে কি প্রকারে? এখন যে পিছন ফিরিবে, সেই মরিবে।

জীব। সম্মুখে ও দক্ষিণপার্শ্ব হইতে আক্রমণ হইতেছে ।
বানপার্শ্বে কেহ নাই, চল অল্পে অল্পে ঘুরিয়া বামদিক দিয়া
বেড়িয়া সরিয়া যাউ ।

ভব। সবিয়া কোণাব যাইবে? সেখানে যে নদী—
নূতন বর্ষায় নদী যে অতি প্রবল হইয়াছে । তুমি ইংরেজের
গোলা হইতে পলাইয়া এই সন্তানসেনা নদীর জলে
ডুবাইবে ?

জীব। নদীর উপর একটা পুল আছে আমার স্মরণ
হইতেছে ।

ভব। এই দশসহস্র সেনা সেই পুলের উপর দিয়া পার
করিতে গেলে এত ভিড হইবে, যে বোধ হয় একটা তোপেই
অবলীলাক্রমে সমুদায় সন্তানসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে ।

জীব। এক কক্ষ কর, অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখ,
এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস ও চাতুর্য্য দেখাইলে—তোমার অসাধ্য
কাজ নাই । তুমি সেই অল্পসংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা
কর । আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে
পুল পার করিয়া লইয়া যাই, তোমার সঙ্গে যাহা রহিল তাহার
নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহা রহিল তাহা বাঁচিলে
বাঁচিতে পারিবে ।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি ।

তখন ভবানন্দ দুই সহস্র সন্তান লইয়া পুনর্বার “বন্দে
মাতরম্” শব্দ উখিত করিয়া ঘোর উৎসাহসহকারে ইংরেজের
গোলন্দাজসৈন্য আক্রমণ করিলেন । সেইখানে ঘোরতর
যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তোপের মুখে সেই ক্ষুদ্র সন্তানসেনা

কতক্ষণ টিকে ? ধানকাটার মত তাহাদিগকে গোলন্দাজেরা ভূমিশায়ী করিতে লাগিল ।

এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তানসেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া বামভাগে কানন বেড়িয়া ধীবে ধীরে চলিলেন । কাপ্তেন টমাসের একজন সহযোগী লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন্ দূর হইতে দেখিলেন যে এক সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাই-তেছে, তখন তিনি একদল ফৌজদারী সিপাহী, এক দল পরগণা সিপাহী লইয়া জীবানন্দের অনুবর্তী হইলেন ।

ইহা কাপ্তেন টমাস্ দেখিতে পাইলেন । সন্তান সম্প্রদায়েব মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে নামা একজন সহযোগীকে বলিলেন যে, “আমি দুই চারি শত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্নবিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বামদিক দিয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন্ যাইতেছেন, দক্ষিণদিক দিয়া তুমি যাও । আর দেখ, আগে গিয়া পুলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে ; তাহা হইলে তিন দিক হইতে উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া জালের পাখীর মত মারিতে পারিব । উহারা দ্রুতপদ দেশী ফৌজ, সন্মাপেক্ষা পলায়নেই সুদক্ষ, অতএব তুমি উহাদিগকে সহজে ধরিতে পারিবে না, তুমি অশ্বারোহীদিগকে একটু ঘুর পথে আড়াল দিয়া গিয়া পুলের মুখে দাঁড়াইতে বল, তাহা হইলে কৰ্ম্ম সিদ্ধ হইবে ।” কাপ্তেন হে তাহাই করিল ।

“অতি দর্পে হতা লক্ষা ।” কাপ্তেন টমাস্ সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া দুইশত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে

যুদ্ধের জয় রাখিয়া আর সকল হের সঙ্গে পাঠাইলেন । চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল তাহা সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন যে “এই কয়জনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে । আর একবার তোমরা ‘জয় জগদীশ হরে’ বল ।” তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানসেনা “জয় জগদীশ হরে” বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল । সে আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহী ও তৈলঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল । ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন । কাপ্তেন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল । ভবানন্দ বলিলেন, “কাপ্তেন সাহেব তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে । কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ ? আইস—তোমার প্রাণদান দিলাম আপাততঃ তুমি বন্দী । ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের ক্ষুহাদ্ ।” কাপ্তেন টমাস তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্য সঙ্গীনসহিত একটা বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মত ধরিয়াছিলেন, কাপ্তেন টমাস নড়িতে পারিল না । তখন ভবানন্দ অনুচর-বর্গকে বলিলেন যে “ইহাকে বাঁধ ।” দুই তিন জন সন্তান আসিয়া কাপ্তেন টমাসকে বাঁধিল । ভবানন্দ বলিলেন ইহাকে একটা ঘোড়ার উপর তুলিয়া লও, চল উহাকে লইয়া আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর আনুকূল্যে যাই ।”

তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানগণ কাপ্তেন টমাসকে ঘোড়ায়

বাধিয়া লইয়া “বন্দে মাতরম্” গায়িতে গায়িতে লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল ।

জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোত্তম, তাহারা পলায়নে উত্তত । জীবানন্দ ও ধীরানন্দ, তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংঘত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না, কতকগুলি পলাইয়া আত্রকাননে আশ্রয় লভিল । অবশিষ্ট সেনা জীবানন্দ ও ধীরানন্দ পুলের মুখে লইয়া গেলেন । কিন্তু সেই খানে হে ও ওয়াটসন্ তাহাদিগকে দুই দিক হইতে ঘিরিল । আর রক্ষা নাই ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

এই সময়ে টমাসেব ভোপগুলি দক্ষিণে আনিয়া পৌঁছিল । তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইল, কেহ বাঁচিবার আর কোন আশা রহিল না । সন্তানেরা যে যেখানে পারিল পলাইতে লাগিল । জীবানন্দ ধীরানন্দ তাহাদিগকে সংঘত এবং একত্রিত করিবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিলেন । কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না । সেই সময় উচ্চৈঃশব্দ হইল “পুলে যাও, পুলে যাও ! ওপারে যাও । নহিলে নদীতে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজসেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও ।”

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে ভবানন্দ । ভবানন্দ

বলিলেন “জীবানন্দ পুলে লইয়া যাও, রক্ষা নাই।” তখন ধীরে ধীরে পিছে হঠিতে হঠিতে সন্তানসেনা পুলের পারে চলিল। কিন্তু পুল পাইয়া বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ স্ফুটন পাইল। পুল একেবারে কাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভবানন্দ জীবানন্দ ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরায়ে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, “জীবানন্দ ধীরানন্দ, এস তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিন জন এই তোপটা দখল করি।” তখন তিন জনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকটবর্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিলেন। তখন আর আর সন্তানগণ তাহাদের সাহায্যে আদিল। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। করতালি দিয়া বলিলেন, “বল বন্দে মাতরম্।” সকলে গায়িল “বন্দে মাতরম্।” ভবানন্দ বলিলেন, “জীবানন্দ, এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ারি করি।” সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। তখন তোপ উচ্চনাদে বৈষ্ণবের কর্ণে যেন হরি হরি শব্দে ডাকিতে লাগিল। বহুতর সিপাহী তাহাতে মরিতে লাগিল। ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া আনিয়া পুলের মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন, “তোমরা দুই জনে সন্তানসেনা সারি দিয়া পুল পার করিয়া লইয়া যাও, আমি একা বাহুমুখ রক্ষা করিব — তোপ চালাইবার জন্ত আমার কাছে জন কয় গোলন্দাজ দিয়া যাও।” কুড়িজন বাছা বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুল পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরা-

নন্দের আক্রমণে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়িজন সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিলেন—কিন্তু যবনসেনা জলোচ্ছ্বাসোথিত তরঙ্গের ন্যায় ! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ !—ভবানন্দকে সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিম্নের ন্যায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক—কামানের শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যবন বাত্যাপীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের ন্যায় তাহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কুড়ি জন সন্তান, তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও মরে না—যবন পুলে ঢুকিতে পায় না। সে বীরেরা অজেয়, সে জীবন অবিনশ্বর। অবসর পাইয়া দলে দলে সন্তানসেনা অপর পারে গেল। আর কিছুকাল পুল রক্ষা করিতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়—এমন সময় কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—“গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম্ বুম্।” উভয় দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় আবার কামান ! দেখিল বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট কামানের শ্রেণী সপ্তদশ মুখে ধূম উৎপাদন করিয়া হে সাহেবের দলের উপরে অগ্নিবৃষ্টি করিল। ঘোর শব্দে বন গিরি সকলই প্রতিধ্বনিত হইল। সমস্ত দিনের মধ্যে ক্রান্ত যবনসেনা প্রাণভয়ে সিহরিল। অগ্নিবৃষ্টিতে তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল দুই চারি জন গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

ভুবানন্দ রক্ত দেখিতেছিলেন। ভুবানন্দ বলিলেন “ভাই, নেচে ভাঙ্গিতেছে, চল একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি।” তখন পিপীলিকাস্রোতোবৎ সস্তানের দল নূতন উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া যবনদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা যবনের উপর পড়িল। যবন যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না—যেমন ভাগীরথীতরঙ্গ সেই দম্ভকারী বৃহৎ পর্কতাকার মত্তহস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সস্তানেরা তেমনি যবনদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। যবনেরা দেখিল পিছনে ভুবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্কনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল, বীর্য্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ সকলই ভাসিয়া গেল। ফোজদারী, বাদসাহী, ইংরাজী, দেশী, বিলাতী, কালা, গোরা সৈন্ত নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। বিধর্ম্মীর দল পলাইল। মার মার শব্দে জীবানন্দ, ভুবানন্দ, ধীরানন্দ, বিধর্ম্মী সেনার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। তাহাদের তেঁপ সস্তানেরা কাড়িয়া লইল, বহুর ইংরেজ ও সিপাহী নিহত হইল। সর্কনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াটসন্ ভুবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল “আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি, আর প্রাণিহত্যা করিও না।” জীবানন্দ ভুবানন্দের মুখপানে চাহিলেন। ভুবানন্দ মনে মনে বলিলেন “তা হইবে মা, আমায় যে আজ মরিতে হইবে।” তখন ভুবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিলেন “মার মার।”

আর এক প্রাণী বাঁচিল না—শেষ একস্থানে ২০৩০ জন

গোরা সৈন্ত একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইল, অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিলেন “ভবানন্দ, আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই, এই কয়জন ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই। উহাদিগকে প্রাণ দান দিয়া চল আমরা ফিরিয়া বাই।” ভবানন্দ বলিলেন “এক জন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না—জীবানন্দ তোমায় দিব্য দিয়া বলিতেছি, যে তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ একা আমি এই কয়জন ইংরেজকে নিহত করি।”

কাপ্তেন টমাস্ অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিল। ভবানন্দ অঞ্জা দিলেন “উহাকে আমার সম্মুখে রাখ, আগে ঐ বেটা মরিবে তবে ত আমি মরিব।”

কাপ্তেন টমাস্ বাঙ্গালা বুদ্ধিত, বুদ্ধিয়া ইংরেজসেনাকে বলিল “ইংরেজ ! আমি তো মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার তার পর এই বিদ্রোহীদিগকে মার।”

ভোঁ করিয়া একটা বুলেট ছুটিল, একজন আইরিস্‌মান্ কাপ্তেন টমাস্‌কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল। ললাটে বিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস্ প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন ডাকিয়া বলিলেন “আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন পার্থ বৃকোদর নকুল সহদেব আছে যে এ সময় আমার রক্ষা করিবে ! দেখ বাণাহত ব্যাঘ্রের ঞ্চায় গোরা আমার উপর ঝুঁকিয়াছে। আমি মরিবার জন্ত আসিয়াছি, আমার সঙ্গে মরিতে চাও এমন সম্ভান কেহ আছে ?”

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে সঙ্গে আর ১০। ১৫। ২০। ৫০ জন সন্তান আসিল। ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বলিলেন “তুমিও যে আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে ?”

ধীর। কেন, মরা কি কাহারও ইজারা মহল না কি ? এই বলিতে বলিতে ধীরানন্দ একজন গোরাকে আহত করিলেন।

ভব। তা নয়। কিন্তু মরিলে ত স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে না !

ধীর। কালিকার কথা বলিতেছ ? এখনও বুদ্ধ নাই ?—
(ধীরানন্দ আহত গোরাকে বধ করিলেন।)

ভব। না—(এই সময়ে এক জন গোরার আঁধাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল।)

ধীর। আমার সাধ্য কি যে তোমার ঞ্চায় পবিত্রাত্মাকে সে সকল কথা বলি। আমি সত্যানন্দের প্রেরিত চর হইয়া গিয়াছিলাম।

ভব। সে কি ? মহারাজের আনার প্রতি অবিশ্বাস ? (ভবানন্দ তখন একহাতে যুদ্ধ করিতেছিলেন) ধীরানন্দ তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, “কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সকল কথা হইয়াছিল তাহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়া ছিলেন।”

ভব। কি প্রকারে ?

ধীর। তিনি তখন স্বয়ং সেখানে ছিলেন। সাবধান থাকিও। (ভবানন্দ এক জন গোরা কর্তৃক আহত হইয়া

তাহাকে প্রত্যাহত করিলেন।) তিনি কল্যাণীকে গীতা পড়াইতে ছিলেন এমন সময়ে তুমি আসিলে। সাবধান ! (ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল।)

ভব। আমার মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিও ! বলিও আমি অবিখ্যাসী নহি।

ধীরানন্দ বাষ্পপূর্ণলোচনে, যুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, “তাহা তিনি জানেন। কালি রাত্রে আশীর্বাদবাক্য মনে কর। আর আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, “ভবানন্দের কাছে থাকিও। আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও আমি আশীর্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে।”

ভবানন্দ বলিলেন “সন্তানের জয় হটুক, ভাই ! আমার মৃত্যুকালে একবার ‘বন্দে মাতরম্’ শুনাও দেখি।”

তখন ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল সন্তান মহাতেজে “বন্দে মাতরম্” গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই তরঙ্গের মূহুর্তে অবশিষ্ট গোরাগণ নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শত্রু রহিল না।

সেই মূহুর্তে ভবানন্দ মুখে “বন্দে মাতরম্” গায়িতে গায়িতে মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হার ! রমণীরূপলাবণ্য ! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্ ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

রণজয়ের পর, অজয়তীরে সত্যানন্দকে বিরিয়া বিজয়ী বীরবর্গ নানা উৎসব করিতে লাগিল । কেবল সত্যানন্দ বিমর্ষ, ভবানন্দের জন্ম ।

এতক্ষণ বৈষ্ণবদিগের রণবাদ্য অধিক ছিল না, কিন্তু সেই সময় কোথা হইতে সহস্র সহস্র কাড়ানাগরা, ঢাক ঢোল, কঁাসি সানাই, তুরী ভেরী, রামসিঙ্গা দামামা আসিয়া জুটিল । জয়সূচক বাদ্যে কাননপ্রাণ্ডর নদী সকল শব্দ ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । এইরূপে সন্তানগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারূপ উৎসব করিলে পর সত্যানন্দ বলিলেন, “জগদীশ্বর আজ কৃপা করিয়াছেন, সন্তানধর্মের জয় হইয়াছে, কিন্তু এক কাজ বাকি আছে । যাহারা আমাদের সঙ্গে উৎসব করিতে পাইল না, যাহারা আমাদের উৎসবের জন্ম প্রাণ দিয়াছে, তাহাদিগকে ভুলিলে চলিবে না । যাহারা রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে, চল যাই, আমরা গিয়া তাহাদিগের সৎকার করি ; বিশেষ যে মহাত্মা আমাদের জন্ম এই রণজয় করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, চল মহান্ উৎসব করিয়া সেই ভবানন্দের সৎকার করি ।” তখন সন্তানদল “বন্দে মাতরম্” বলিতে বলিতে নিহতদিগের সৎকারে চলিল । বহুলোক একত্রিত হইয়া হরিবোল দিতে দিতে ভারে ভারে চন্দনকাষ্ঠ বহিয়া আনিয়া ভবানন্দের চিতা রচনা করিল, এবং তাহাতে ভবা-

নন্দকে শায়িত করিয়া, অগ্নিজ্বালিত করিয়া, চিতা বেড়িয়া বেড়িয়া “হরে মুরারে” গায়িতে লাগিল। ইহারা বিক্ষুব্ধ, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে।

কাননমধ্যে তৎপরে কেবল সত্যানন্দ, জীবানন্দ, মহেন্দ্র, নবীনানন্দ ও ধীরানন্দ আসীন; গোপনে পাঁচজনে পরামর্শ করিতেছেন। সত্যানন্দ বলিলেন “এত দিন যে জন্তু আমরা সর্কধর্ম সর্কস্থ ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ব্রত সফল হইয়াছে, এ প্রদেশে যবন সেনা আর নাই, যাহা অবশিষ্ট আছে, একদণ্ড আমাদের নিকট টিকিবে না, তোমরা এখন কি পরামর্শ দাও?”

জীবানন্দ বলিলেন “চলুন এই সময়ে গিয়া রাজধানী অধিকার করি।”

সত্য। আমারও সেই মত।

ধীরানন্দ। সৈন্ত কোথায়?

জীব। কেন এই সৈন্ত?

ধীর। এই সৈন্ত কই? কাহাকে দেখিতে পাইতেছেন?

জীব। স্থানে স্থানে সব বিশ্রাম করিতেছে, ডঙ্কা দিলে অবশ্য পাওয়া যাইবে।

ধীর। একজনকেও পাইবেন না।

সত্য। কেন?

ধীর। সবাই লুঠিতে বাহির হইয়াছে। গ্রাম সকল এখন অরক্ষিত। মুসলমানের গ্রাম আর রেশমের কুঠি লুঠিয়া সকলে ঘরে যাইবে। এখন কাহাকেও পাইবেন না। আমি খুঁজিয়া আসিয়াছি।

সত্যানন্দ বিষণ্ণ হইলেন, বলিলেন, “বাই হউক, এ প্রদেশ সমস্ত আমাদের অধিকৃত হইল। এখানে আর কেহ নাই যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। অতএব বরেন্দ্রভূমিতে তোমরা সম্ভানরাজ্য প্রচাৰ কর। প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় কর এবং নগর অধিকার করিবার জন্ত সেনা সংগ্রহ কর। হিন্দুর রাজ্য হইয়াছে শুনিলে, বহুতর সেনা, সম্ভানের নিশান উড়াইবে।”

তখন জীবানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দকে প্রাণম করিয়া বলিলেন “আমরা প্রণাম করিতেছি—হে মহারাজাধিরাজ! আজ্ঞা হয় ত আমরা এই কাননেই আপনার সিংহাসন স্থাপিত করি।”

সত্যানন্দ তাঁহার জীবনে এই প্রথম কোপ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন “ছি! আমায় কি শূণ্য কুন্ত মনে কর? আমরা কেহ রাজা নহি—আমরা সন্ন্যাসী। এখন দেশের বাজা বৈকুণ্ঠনাথ স্বয়ং। নগর অধিকার হইলে, যাহার শিরে তোমাদিগের ইচ্ছা হয়, রাজমুকুট পরাইও, কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানিও যে আমি এই ব্রহ্মচর্যা ভিন্ন আর কোন আশ্রমই স্বীকার করিব না। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব কর্মে যাও।”

তখন চারি জনে ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া গাত্রোথান করিলেন। সত্যানন্দ তখন অস্ত্রের অলঙ্কিতে ইঙ্গিত করিয়া মহেন্দ্রকে রাখিলেন। আর তিন জন চলিয়া গেলেন, মহেন্দ্র রহিলেন। সত্যানন্দ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, “তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সম্ভানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। জীবানন্দ ও জীবানন্দ দুই জনেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে, জীবানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্বদা

ভয় কোন্ দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেহ বিসর্জন করে । কিন্তু আমার এক ভরসা আছে, কোন নিগূঢ় কারণে সে এক্ষণে মরিতে পারিবে না । তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ । এক্ষণে সন্তানের কার্যোদ্ধার হইল, প্রতিজ্ঞা ছিল যে যতদিন না সন্তানের কার্যোদ্ধার হয়, ততদিন তুমি স্ত্রী কণ্ঠ্য মুখদর্শন করিবে না, এক্ষণে কার্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার ।”

মহেন্দ্রের চক্ষে দরদবিত ধারা বহিল । মহেন্দ্র বলিলেন “ঠাকুন সংসারী হইব কাহাকে লইয়া? স্ত্রী ত আয়ুঘাতিনী হইয়াছেন, আর কণ্ঠ্য কোথায় যে তাতো জানি না, কোথায় বা সন্ধান পাইব? আপনি বলিয়াছেন, জীবিত আছে । ইহাই জানি আর কিছু জানি না ।”

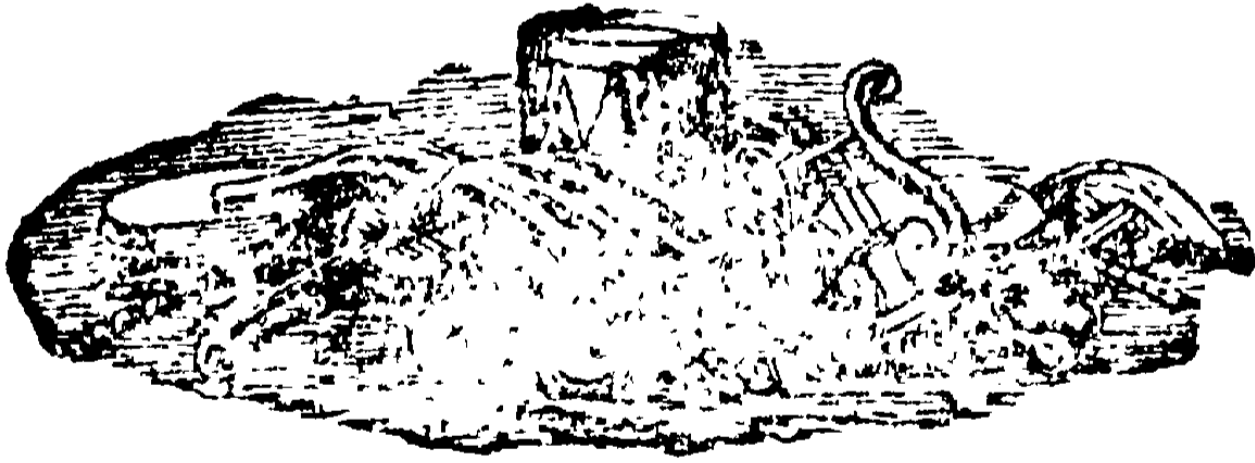
সত্যানন্দ তখন নবীনানন্দকে ডাকিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, “ইনি, নবীনানন্দ গোস্বামী—অতি পবিত্রচেতা, আমার প্রিয়শিষ্য । ইনি তোমার কণ্ঠ্যর সন্ধান বলিয়া দিবেন ।” এই বলিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে কিছু ইঙ্গিত করিলেন । শান্তি তাহা বুঝিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন মহেন্দ্র বলিলেন “কোথায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে?”

শান্তি বলিল, “আমার আশ্রমে আসুন ।” এই বলিয়া শান্তি আগে আগে চলিল ।

তখন মহেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন এবং শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । তখন অনেক রাত্রি হইয়াছে । তথাপি শান্তি বিশ্রাম না করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল ।

সকলে চলিয়া গেলে ব্রহ্মচারী, একা ভূমে প্রণত হইয়া মাটিতে মস্তক স্থাপন করিয়া মনে মনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল। এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিল, “আমি আসিয়াছি।”

ব্রহ্মচারী উঠিয়া চমকিত হইয়া অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “আপনি আসিয়াছেন? কেন?” যে আসিয়াছিল সে বলিল, “দিন পূর্ণ হইয়াছে।” ব্রহ্মচারী বলিলেন, “হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।”



চতুর্থ খণ্ড





চতুর্থ খণ্ড ।



প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সেই রজনীতে হরিধ্বনিতে সে প্রদেশভূমি পরিপূর্ণা হইল । সস্তানেরা দলে দলে যেখানে সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কেহ “বন্দে মাতরম্” কেহ “জগদীশ হরে” বলিয়া গায়িয়া বেড়াইতে লাগিল । কেহ শত্রুসেনার অঙ্গ, কেহ বস্ত্র অপহরণ করিতে লাগিল । কেহ মৃতদেহের মুখে পদাঘাত, কেহ অন্য প্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল । কেহ গ্রামাভিমুখে, কেহ নগরাভিমুখে ধাবমান হইয়া, পথিক বা গৃহস্থকে ধরিয়া বলে “বল বন্দে মাতরম্” নহিলে মারিয়া ফেলিব । কেহ ময়রার দোকান লুটিয়া খায়, কেহ গোয়ালার বাড়ী গিয়া হাঁড়ি পাড়িয়া দধিতে চুমুক মারে, কেহ বলে “আমরা ব্রহ্মগোপ আসিয়াছি, গোপিন

কই ?” সেই এক রাত্রে মধ্য গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, “মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।” গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্ব্বশ্ব লুটিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাথিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, “মুই হেঁছ।”

দলে দলে ত্র্যস্ত মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। চারিদিকে রাজপুরুষেরা ছুটিল, অবশিষ্ট সিপাহী সুসজ্জিত হইয়া নগররক্ষার্থে শ্রেণীবদ্ধ হইল। নগরের গড়ের ঘাটে ঘাটে প্রকোষ্ঠ সকলে রক্ষকবর্গ সশস্ত্রে অতি সাবধানে, দ্বার-রক্ষায় নিযুক্ত হইল। সমস্ত লোক সমস্তরাত্রি জাগরণ করিয়া কি হয় কি হয় চিন্তা করিতে লাগিল। হিন্দুরা বলিতে লাগিল “আসুক সন্ন্যাসীরা আসুক, মা ছুর্গা করুন, হিন্দুর অদৃষ্টে সেই দিন হউক।” মুসলমানেরা বলিতে লাগিল “আল্লা আকবর ! এত্না রোজের পর কোরাণসরিফ্ বেবাক্ কি খুঁটো হলো; মোরা যে পাঁচু ওয়াক্ত নমাজ করি, তা এই তেলককাটা হেঁছের দল ফতে কর্তে নাৰ্লাম। ছুনিয়ার সব ফাঁকি।” এইরূপে কেহ ক্রন্দন, কেহ হাস্য করিয়া সকলেই ঘোরতর আগ্রহের সহিত রাত্রি কাটাইতে লাগিল।

এ সকল কথা কল্যাণীর কাণে গেল—আবালবৃদ্ধবনিতা

কাহারও অবিদিত ছিল না। কল্যাণী মনে মনে বলিল, “জয় জগদীশ্বর! আজি তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আজ আমি স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিব। হে মধুসূদন! আজ আমার সহায় হও!”

গভীর রাত্রে কল্যাণী শয্যা ত্যাগ করিয়া, উঠিয়া, একা খিড়কির দ্বার খুলিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া, কাহাকে কোথাও না দেখিয়া, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে গোরীদেবীর পুরী হইতে রাজপথে নিষ্ক্রান্ত হইল। মনে মনে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিয়া বলিল, “দেখ ঠাকুর, আজ যেন পদচিহ্নে তাঁর সাক্ষাৎ পাই।”

কল্যাণী নগরের ঘাটিতে আসিয়া উপস্থিত। পাহারা-ওয়াল বলিল “কে যায়?” কল্যাণী ভীতস্বরে বলিল “আমি স্ত্রীলোক।” পাহারাওয়াল বলিল “যাবার হুকুম নাই।” কথা দফাদারের কাণে গেল। দফাদার বলিল “বাহিরে যাইবার নিষেধ নাই, ভিতরে আসিবার নিষেধ। শুনিয়া পাহারাওয়াল কল্যাণীকে বলিল “যাও মাগি, যাবার মানা নাই, লেকেন্ আজ্কা রাত্বে বড় আক্ন্ত, কেয়া জানে মাগি তোমার কি হোবে, তুমি কি ডেকেতের হাতে গির্বে, কি খানায় পড়িয়া মরিয়ে যাবে, সো তো হাম্ কিছু জানে না, আজ্কা রাত মাগি, তুমি বাহার না যাবে।”

কল্যাণী বলিল, “বাবা আমি ভিখারিণী—আমার এক কড়া কপর্দক নাই, আমায় ডাকাতে কিছু বলিবে না।”

পাহারাওয়াল বলিল “বয়স আছে, মাগি বয়স আছে, ছনিয়ামে ওহি তো জেওরাত হ্যায়! বল্কে হামি ডেকেত

হতে পারে।” কল্যাণী দেখিল বড় বিপদ, কিছু কথা না কহিয়া, ধীরে ধীরে ঘাট এড়াইয়া চলিয়া গেল। পাহারা-ওয়াল দেখিল মায়ি রসিকতাটা বুঝিল না, তখন মনের হুঃখে গাঁজায় দম মারিয়া ঝিকিট খান্ধাজে সোরির টপ্পা ধরিল। কল্যাণী চলিয়া গেল।

সে রাতে পথে দলে দলে পথিক, কেহ মার মার শব্দ করিতেছে, কেহ পালাও পালাও শব্দ করিতেছে, কেহ কান্দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, যে যাহাকে দেখিতেছে, সে তাহাকে ধরিতে যাইতেছে। কল্যাণী অতিশয় কষ্টে পড়িল। পথ মনে নাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, সকলে রণোন্মুখ। কেবল লুকাইয়া লুকাইয়া অন্ধকারে পথ চলিতে হইতেছে। লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেও এক দল অতি উদ্ধত উন্মত্ত বিদ্রোহীর হাতে সে পড়িয়া গেল। তাহারা ঘোর চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিল। কল্যাণী তখন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানেও সঙ্গে সঙ্গে দুই একজন দস্যু তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। একজন গিয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিল, বলিল “তবে চাঁদ।” সেই সময়ে আর একজন অকস্মাৎ আসিয়া অত্যাচারকারী পুরুষকে এক ঘা লাঠি মারিল। সে আহত হইয় পাছু হটিয়া গেল। এই ব্যক্তির সন্ন্যাসীর বেশ—কৃষ্ণাজিনে ঝক্ক আবৃত, বয়স অতি অল্প। সে কল্যাণীকে বলিল “তুমি ভয় করিও না, আমার সঙ্গে আইস—কোথায় যাইবে?”

ক। পদচিহ্নে।

আগন্তুক বিস্মিত ও চমকিত হইল, বলিল “সে কি পদ

চিহ্নে ?” এই বলিয়া আগন্তুক কল্যাণীর দুই স্বক্কে হস্ত স্থাপন করিয়া মুখপানে সেই অন্ধকারে অতি যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ।

কল্যাণী অকস্মাৎ পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত, ভীত, ফুঁক, বিস্মিত, অশ্রুবিপ্লুত হইল—এমন সাধ্য নাই যে পলায়ন করে, ভীতিবিহ্বলা হইয়া গিয়াছিল । আগন্তুকের নিরীক্ষণ শেষ হইলে সে বলিল “হরে মুরারে ! চিনেছি যে, তুমি পোড়ার মুখী কল্যাণী !”

কল্যাণী ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল “আপনি কে ?”

আগন্তুক বলিল, “আমি তোমার দাসানুদাস—হে সুন্দরি ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।”

কল্যাণী অতি দ্রুতবেগে সেখান হইতে সরিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল “এই অপমান করিবার জ্ঞাই কি আপনি আমাকে রক্ষা করিলেন ? দেখিতেছি ব্রহ্মচারীর বেশ, ব্রহ্মচারীর কি এই ধর্ম ? আমি আজ নিঃসহায়, নহিলে তোমার মুখে আমি নাথি মারিতাম ।”

ব্রহ্মচারী বলিল, “অগ্নি স্মিতবদনে ! আমি বহুদিবসাবধি, তোমার ঐ বরবপুর স্পর্শ কামনা করিতেছি ।” এই বলিয়া ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া কল্যাণীকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিল । তখন কল্যাণী খিল খিল করিয়া হাসিল, বলিল, “ও পোড়া কপাল ! আগে বলতে হয় ভাই, যে আমারও ঐ দশা ।” শাস্তি বলিল “ভাই, মহেন্দ্রের খোঁজে চলিয়াছ ?”

কল্যাণী বলিল “তুমি কে, তুমি যে সব জান দেখিতেছি ।”

শান্তি বলিল, “আমি ব্রহ্মচারী—সন্তানসেনার অধিনায়ক—
যোরতর বীরপুরুষ ! আমি সব জানি ! আজ পথে সিপাহী
আর সন্তানের যে দৌরাখ্যা, তুমি আজ পদচিহ্নে যাইতে
পারিবে না ।”

কল্যাণী কাঁদিতে লাগিল ।

শান্তি চোখ ঘুরাইয়া বলিল, “ভয় কি ? আমরা নয়নবাণে
সহস্র শত্রু বধ করি । চল পদচিহ্নে যাই ।”

কল্যাণী একপ বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের সহায়তা পাইয়া বেন
হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল । বলিল, “তুমি যেখানে লইয়া
যাইবে সেইখানেই যাইব ।”

শান্তি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া বন্থপথে লইয়া চলিল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

যখন শান্তি আপন আশ্রম ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রে নগরা-
ভিমুখে যাত্রা করে, তখন জীবানন্দ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন ।
শান্তি জীবানন্দকে বলিল “আমি নগরে চলিলাম । মহেন্দ্রের
স্ত্রীকে লইয়া আসিব । তুমি মহেন্দ্রকে বলিয়া রাখ যে উহার
স্ত্রী আছে ।”

জীবানন্দ জীবানন্দের কাছে কল্যাণীর জীবনরক্ষা বাস্তব

সকল অবগত হইয়াছিলেন—এবং তাহার বর্তমান বাসস্থানও নরকস্থান-বিচারিণী শাস্তির কাছে শুনিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল মহেন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। শেষে আনন্দে অভিভূত হইয়া মুগ্ধ প্রায় হইলেন।

সেই রজনী প্রভাতে শাস্তির সাহায্যে মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর সাক্ষাৎ হইল। নিস্তরু কাননমধ্যে, ঘনবিন্যস্ত শাল-তরুশ্রেণীর অন্ধকারছায়া মধ্যে, পশু পক্ষী ভগ্ননিদ্র হইবার পূর্বে, তাহাদিগের পরস্পরের দর্শনলাভ হইল। সাক্ষী কেবল সেই নীলগগনবিহারী স্নানকিরণ আকাশের নক্ষত্রচয়, আর সেই নিষ্কম্প অনন্ত শালতরুশ্রেণী। দূরে কোন শীলাসংঘর্ষণ-নাদিনী, মধুরকল্লোলিনী, সংকীর্ণ নদীর তর তর শব্দ, কোথাও প্রাচীসমুদিত উষায়ুকুটজ্যোতিঃ সন্দর্শনে আহ্লাদিত এক কোকিলের রব।

বেলা এক প্রহর হইল। সেখানে শাস্তি জীবানন্দ আসিয়া দেখা দিলেন। কল্যাণী শাস্তিকে বলিল—“আমরা আপনার কাছে বিনা মূল্যে বিক্রীত। আমাদের কণ্ঠাটির সন্ধান বলিয়া দিয়া এ উপকার সম্পূর্ণ করুন।”

শাস্তি জীবানন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল “আমি ঘুমাইব। অষ্টপ্রহরের মধ্যে বসি নাই—তুই রাত্রি ঘুমাই নাই—আমি যাই পুরুষ!”

কল্যাণী ঈষৎ হাসিল। জীবানন্দ মহেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “সে ভার আমার উপর রহিল। আপনারা পদচিহ্নে গমন করুন—সেইখানে কণ্ঠাকে পাইবেন।”

জীবানন্দ ভরুইপুরে নিমাইয়ের নিকট হইতে মেয়ে আনিতে গেলেন—কাজটা বড় সহজ বোধ হইল না ।

তখন নিমাই প্রথমে ঢোক গিলিল, একবার এদিক ওদিক চাহিল । তার পর একবার তার ঠোঁট নাক ফুলিল । তার পর সে কাঁদিয়া ফেলিল । তারপর বলিল, “আমি মেয়ে দিব না ।”

নিমাই, গোল হাতখানির উন্টাপিঠ চোখে দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চক্ষু মুছিলে পব জীবানন্দ বলিলেন, “তা দিদি কাঁদ কেন, এমন দূরও তো নয়—তাদের বাড়ী তুমি না হয় গেলে, মধ্যে মধ্যে দেখে এলে ।”

নিমাই ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, “তা তোমাদের মেয়ে তোমরা নিয়ে যাও-না কেন ? আমার কি ?” নিমাই এই বলিয়া স্কুমারীকে আনিয়া রাগ করিয়া ছম করিয়া জীবানন্দের কাছে ফেলিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল । সুতরাং জীবানন্দ তখন আর কিছু না বলিয়া এদিক ওদিক বাজে কথা কহিতে লাগিলেন । কিন্তু নিমাইয়ের রাগ পড়িল না । নিমাই উঠিয়া গিয়া স্কুমারীর কাপড়ের বোচকা, অলঙ্কারের বাক্স, চুলের দড়ি, খেলার পুতুল রূপরূপ করিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে ফেলিয়া দিতে লাগিল । স্কুমারী সে সকল আপনি গুছাইতে লাগিল । সে নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল “হাঁ মা—কোথায় যাব মা ?” নিমাইয়ের আর সহ্য হইল না । নিমাই তখন স্কুকুকে কোলে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পদচিহ্নে নূতন দুর্গমধ্যে, আজ সূখে সমবেত, মহেন্দ্র, কল্যাণী, জীবানন্দ, শান্তি, নিমাই, নিমাইয়ের স্বামী, স্কুমারী । সকলে সূখে সম্মিলিত । শান্তি নবীনানন্দের বেশে আসিয়াছিল । কল্যাণীকে যে রাত্রে আপন কুটারে আনে সেই রাত্রে বারণ করিয়াছিল, যে নবীনানন্দ যে স্ত্রীলোক এ কথা কল্যাণী স্বামীর সাক্ষাতে প্রকাশ না করেন । একদিন কল্যাণী তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন । নবীনানন্দ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল । ভৃত্যগণ বারণ করিল, শুনিল না ।

শান্তি কল্যাণীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “ডাকিয়াছ কেন ?”

ক । পুরুষ সাজিয়া কতদিন থাকিবে ? দেখা হয় না,— কথা কহিতেও পাই না । আমার স্বামীর সাক্ষাতে তোমায় প্রকাশ হইতে হইবে ।

নবীনানন্দ বড় চিন্তিত হইয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না । শেষে বলিলেন, “তাহাতে অনেক বিষয় কল্যাণি !”

দুই জনে সেই কথাবার্তা হইতে লাগিল । এদিকে যে ভৃত্যবর্গ নবীনানন্দের অন্তঃপুরে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিল, তাহারা গিয়া মহেন্দ্রকে সংবাদ দিল, যে নবীনানন্দ জোর করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, নিষেধ মানিল না । কোতূ-

হলী হইয়া মহেন্দ্রও অন্তঃপুরে গেলেন। কল্যাণীর শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন, যে নবীনানন্দ গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, কল্যাণী তাহার গায়ে হাত দিয়া বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া দিতেছেন। মহেন্দ্র অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন—অতিশয় রুষ্ঠ হইলেন।

নবীনানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, “কি গোসাই! সন্তানে সন্তানে অবিশ্বাস?”

মহেন্দ্র বলিলেন, “ভবানন্দ ঠাকুর কি বিশ্বাসী ছিলেন?”

নবীনানন্দ চোখ ঘুবাংয়া বলিল, “কল্যাণী কি ভবানন্দের গায়ে হাত দিয়া বাঘছাল খুলিয়া দিত?” বলিতে বলিতে শান্তি কল্যাণীর হাত টিপিয়া ধরিল, বাঘছাল খুলিতে দিল না।

ম। তাতে কি?

ন। আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন—কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে?

এবার মহেন্দ্র বড় অপ্রতিভ হইলেন! বলিলেন, “কই কিসে অবিশ্বাস করিলাম?”

ন। নহিলে আমার পিছু পিছু অন্তঃপুর আসিয়া উপস্থিত কেন?

ম। কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল; তাই আসিয়াছি।

ন। তবে এখন যান। কল্যাণীর সঙ্গে আমারও কিছু কথা আছে। আপনি সরিয়া যান, আমি আগে কথা কই। আপনার ঘর বাড়ী, আপনি সর্বদা আসিতে পারেন, আমি কষ্টে একবার আসিয়াছি।

মহেন্দ্র বোকা হইয়া রহিলেন । কিছুই বুঝিতে পারিতে-
ছেন না । এ সকল কথা ত অপরাধীর কথাবার্তার মত নহে ।
কল্যাণীরও ভাব বিচিত্র । সেও ত অবিশ্বাসিনীর মত
পলাইল না, ভীতা হইল না, লজ্জিতা নহে—কিছুই না, বরং
মৃহ মৃহ হাসিতেছে । আর কল্যাণী—যে সেই বৃক্ষতলে
অনায়াসে বিষ ভোজন করিয়াছিল—সে কি অপরাধিনী হইতে
পারে ? মহেন্দ্র এই সকল ভাবিতেছেন, এমত সময়ে অভাগিনী
শান্তি, মহেন্দ্রের ছুরবস্থা দেখিয়া ঈর্ষ্য হাসিয়া কল্যাণীর
প্রতি এক বিলোল কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করিল । সহসা তখন অন্ধ-
কার ঘুটিল—মহেন্দ্র দেখিলেন, এ যে রমণীকটাক্ষ । সাহসে
ভর করিয়া, নবীনানন্দের দাড়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিলেন
—কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ খসিয়া আসিল । সেই সময়ে অবসর
পাইয়া, কল্যাণী বাঘছালের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিল—বাঘছালও
খসিয়া পড়িল । ধরা পড়িয়া শান্তি অবনতমুখী হইয়া রহিল ।

মহেন্দ্র তখন শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে ?”

শা । শ্রীমান্ নবীনানন্দ গোস্বামী ।

ম । সে ত জুয়াচুরি ; তুমি স্ত্রীলোক ?

শা । এখন কাজে কাজেই ।

ম । তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্ত্রীলোক
হইয়া সৰ্ব্বদা জীবানন্দ ঠাকুরের সহবাস কর কেন ?

শা । সে কথা আপনাকে নাই বলিলাম ।

ম । তুমি যে স্ত্রীলোক, জীবানন্দ ঠাকুর তা কি জানেন ?

শা । জানেন ।

• শুনিয়া, বিস্ময়া মহেন্দ্র অতিশয় বিষন্ন হইলেন ।

দেখিয়া কল্যাণী আর থাকিতে পারিল না, বলিল, “ইনি জীবানন্দ গোস্বামীর ধর্মপত্নী শান্তিদেবী ।”

মুহূর্ত্ত জন্ম মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল । আবার সে মুখ অন্ধকারে ঢাকিল । কল্যাণী বুঝিল, বলিল, “ইনি ব্রহ্ম-চারিণী ।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

উত্তর বাঙ্গালা মুসলমানের হাত ছাড়া হইয়াছে । মুসলমান কেহই এ কথা মানেন না—মনকে চোক ঠারেন—বলেন কতকগুলো লুঠেড়াতে বড় দৌরাখ্যা করিতেছে—শাসন করিতেছি । এইরূপ কতকাল যাইত বলা যায় না ; কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কলিকাতার পবর্ণর জেনারেল । ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ মনকে চোক ঠারিবার লোক নহেন—তার সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত ? অগৌণে সম্তান শাসনার্থে Major Edwards নামা দ্বিতীয় সেনাপতি নূতন সেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন ।

এডওয়ার্ডস্ দেখিলেন, যে এ ইউরোপীয় যুদ্ধ নহে । শত্রু-দিগের সেনা নাই, নগর নাই, রাজধানী নাই, দুর্গ নাই, অথচ সকলই তাহাদের অধীন । যে দিন যেখানে ব্রিটিশ সেনার

শিবির, সেই দিনের জন্ত সে স্থান ব্রিটিশসেনার অধীন—
তার পরদিন ব্রিটিশসেনা চলিয়া গেল ত অমনি চারিদিকে
“বন্দে মাতরম্” গীত হইতে লাগিল। সাহেব খুঁজিয়া পান না
কোথা হইতে ইহারা পিপীলিকার মত এক এক রাত্রে নির্গত
হইয়া যে গ্রাম ইংরেজের বশীভূত হয় তাহা দাহ করিয়া যায়,
অথবা অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা পাইলে তৎক্ষণাৎ সংহার
করে। অনুসন্ধান করিতে করিতে সাহেব জানিলেন যে,
পদচিহ্নে ইহারা দুর্গনির্মাণ করিয়া সেইখানে আপনাদিগের
অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করিতেছে। অতএব সেই দুর্গ
অধিকার করা বিধেয় বলিয়া স্থির করিলেন।

চরের দ্বারা তিনি সংবাদ লইতে লাগিলেন যে, পদচিহ্নে
কত সস্তান থাকে। যে সংবাদ পাইলেন তাহাতে তিনি সহসা
দুর্গ আক্রমণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে
এক অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবন করিলেন।

মাঘী পূর্ণিমা সম্মুখে উপস্থিত। তাহার শিবিরের অদূর-
বর্তী নদীতীরে একটা মেলা হইবে। এবার মেলায় বড়
ঘটা। সহজে মেলায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।
এবার বৈষ্ণবের রাজ্য হইয়াছে, বৈষ্ণবেরা মেলায় আসিয়া
বড় জাঁক করিবে সংকল্প করিয়াছে। অতএব যাবতীয় সস্তান-
গণের পূর্ণিমার দিন মেলায় একত্র সমাগম হইবে, এমন
সম্ভাবনা। মেজর এডওয়ার্ডস্ বিবেচনা করিলেন যে পদচিহ্নের
রক্ষকেরাও সকলেই মেলায় আসিবার সম্ভাবনা। সেই সময়েই
সহসা পদচিহ্নে গিয়া দুর্গ অধিকৃত করিবেন।

এই অভিপ্রায় করিয়া, মেজর রটনা করিলেন, যে তিনি

মেলা আক্রমণ করিবেন। এক ঠাই সকল বৈষ্ণব পাইয়া এক দিনে শত্রু নিঃশেষ করিবেন। বৈষ্ণবের মেলা হইতে দিবেন না।

এ সংবাদ গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। তখন যেখানে যে সম্মানসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মেলা রক্ষার জন্তু ধাবিত হইল। সকল সম্মানই নদীতীরে আসিয়া বাঘী পূর্ণিমায় মিলিত হইল। সেন্সর সাহেব মাহা ভাবিয়া-ছিলেন তাহাই ঠিক হইল। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে মহেন্দ্রও ফাঁদে পা দিলেন, মহেন্দ্র পদচিহ্নের দুর্গে অল্পমাত্র সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্য লইয়া মেলায় যাত্রা করিলেন।

এ সকল কথা হইবার আগেই জীবানন্দ ও শাস্তি পদচিহ্ন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তখন যুদ্ধের কোন কথা হয় নাই, যুদ্ধে তাঁহাদের তখন মন ছিল না। মাঘী পূর্ণিমায়, পুণ্যদিনে, শুভক্ষণে, পবিত্র জলে প্রাণ বিসর্জন করিয়া, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ইহাই তাঁহাদের অভি-সন্ধি। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা শুনিলেন যে মেলায় সমবেত সম্মানদিগের সঙ্গে ইংরেজসৈন্তের মহাযুদ্ধ হইবে। তখন জীবানন্দ বলিলেন, “তবে যুদ্ধেই মরিব শীঘ্র চল।”

তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র চলিলেন। পথ এক স্থানে একটা টিলার উপর দিয়া গিয়াছে। টিলায় উঠিয়া, বীরদম্পতী দেখিতে পাইলেন—যে নিম্নে কিছু দূরে ইংরেজশিবির। শাস্তি বলিল, “মরার কথা এখন থাক—বল ‘বন্দে মাতরম্’।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

তখন দুই জনে কাণে কাণে কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ করিয়া জীবানন্দ এক বনে লুকাইলেন। শান্তি আর এক বনে প্রবেশ করিয়া এক অদ্ভুত রহস্যে প্রবৃত্ত হইল।

শান্তি মরিতে যাইতেছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে স্ত্রীবেশ ধরিবে ইহা স্থির করিয়াছিল। তাহার এ পুরুষবেশ জুয়াচুরি, মহেন্দ্র বলিয়াছে। জুয়াচুরি করিতে করিতে মরা হইবে না স্মতরাং ঝাঁপি টেপারিটি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তাহাতে তাহার সজ্জা সকল থাকিত। এখন নবীনানন্দ ঝাঁপি টেপারি খুলিয়া বেশপরিবর্তনে প্রবৃত্ত হইল।

চিকন স্বকম রসকলির উপরে খয়েরের টিপ কাটিয়া তৎকাল-প্রচলিত কুরফুরে কোঁকড়া কোঁকড়া কতকগুলি ঝাপটার গোছায় চাঁদমুখ খানি ঢাকিয়া, শান্তি একটি সারস্ব হস্তে বৈষ্ণবীবেশে, ইংরেজশিবিরে দর্শন দিল। দেখিয়া ভ্রমর-কৃষ্ণশ্রমযুক্ত সিপাহীরা বড় মাতিয়া গেল। কেহ টপ্পা, কেহ গজল, কেহ শ্রামাবিষয়, কেহ কৃষ্ণবিষয়, ফরমাস করিয়া শুনিল। কেহ চাল দিল, কেহ ডাল দিল, কেহ মিষ্ট দিল, কেহ পয়সা দিল, কেহ সিকি দিল। বৈষ্ণবী তখন শিবিরের অবস্থা স্বচক্ষে সবিশেষ দেখিয়া, চলিয়া যায়, সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল, “আবার কবে আসিবে?” বৈষ্ণবী বলিল, “তা জানি না, আমার বাড়ী ঢের দূর।” সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করিল,

“কত দূর ?” বৈষ্ণবী বলিল, “আমার বাড়ী পদচিহ্নে।” এখন সেই দিন মেজর সাহেব পদচিহ্নের কিছু খবর লইতেছিলেন। একজন সিপাহী তাহা জানিত। বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া কাপ্তেন সাহেবের কাছে লইয়া গেল। কাপ্তেন সাহেব তাহাকে মেজর সাহেবের কাছে লইয়া গেল। মেজর সাহেবের কাছে গিয়া বৈষ্ণবী মধুর হাসি হাসিয়া, মর্মভেদী কটাক্ষে সাহেবের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া গান ধরিল—

“লেচ্ছনিবহনিধনে, কলয়সি করবালম্।”

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “টোমাড় বাড়ী কোঠা বিবি ?”

বিবি বলিল, “আমি বিবি নই, বৈষ্ণবী। বাড়ী পদচিহ্নে।”

সাহেব। Well that is Padsin—Padsin is it ? হুঁয়া একটো গর হ্যায় ?”

বৈষ্ণবী বলিল, “ঘর ?—কত ঘর আছে।”

সাহেব। গর নেই,—গর নেই,—গর,—গর—

শান্তি। সাহেব তোমার মনের কথা বুঝেছি। গড় ?

সাহেব। ইয়েস্ ইয়েস্, গর ! গর !—হ্যায় ?

শান্তি। গড় আছে। ভারি কেলা।

সাহেব। কেটে আড়মি।

শান্তি। গড়ে কত লোক থাকে ? বিশ পঞ্চাশ হাজার।

সাহেব। নসেন্স্। একটো কেলেনে ডো চার হাজার রহে শক্তা। হুঁয়া পর আবি হ্যায় ? ইয়া নিকেল গিয়া ?

শান্তি। আবার নেকলাবে কোথা ?

সাহেব। মেলামে—টোম কব আয়া হ্যায় হুঁয়াসে ?

শান্তি। কাল্ এসেছি মায়েব।

সাহেব। ও লোক আজ নিকেল্ গিয়া হোগা।

শান্তি মনে মনে ভাবিতেছিল যে, “তোমার বাপের শ্রদ্ধের চাল যদি আমি না চড়াই, তবে আমার রসকলি কাটাই বৃথা। কতক্ষণে শিয়ালে তোমার মুণ্ড খাবে আমি দেখবো।” প্রকাশ্যে বলিল, “তা সাহেব হতে পারে, আজ বেরিয়ে গেলে যেতে পারে। অত খবব আমি জানি না, বৈষ্ণবী মানুষ, গান গেয়ে ভিক্ষা শিক্ষা করে খাই, অত খবর রাখি নে। বকে বকে গলা শুকিয়ে উঠলো, পয়সাটা দাও—উঠে চলে যাই। আর ভাল করে বক্শিশ দাও তো না হয় পরশু এসে বলে যাব।”

সাহেব ঝনাৎ করিয়া একটা নগদ টাকা ফেলিয়া দিয়া, বলিল—“পরশু নেহি বিবি!”

শান্তি বলিল, “দূর বেটা! বৈষ্ণবী বল্, বিবি কি?”

এড্ ওয়ার্ড্‌স্। পরশু নেহি, আজ রাংকো হামকো খবর মিল্‌না চাহিয়ে।

শান্তি। বন্দুক মাথায় দিয়ে সরাপ টেনে সরষের তেল নাকে দিয়ে ঘুমো। আজ আমি দশ কোশ রাস্তা যাব—আসবো—ওঁকে খবর এনে দেব! ছুঁচো বেটা কোথাকার!

এড্। ছুঁচো ব্যাটা কেস্কা কয়তা হ্যায়?

শান্তি। যে বড় বীর—ভারি জাঁদরেল।

এড্। Great General হাম হো শক্তা হ্যায়—ক্রাইব্‌কা মারফিক। লেকেন আজ হামকো খবর মিল্‌নে চাহিয়ে। শও-রুপেয়া বখসিস্‌ দেঙ্গে।

শান্তি । শই দাও আর হাজার দাও, বিশ ক্রোশ এ
তুখানা ঠেঙ্গে হবে না ।

এড্ । ঘোড়ে পর ।

শান্তি । ঘোড়ায় চড়তে জানলে আর তোমার তাঁবুতে
এসে সাবেঙ্গ বাজায়ে ভিক্ষে করি ?

এড্ । গদি পর লে যায়েগা ।

শান্তি । কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবে ? আমার লজ্জা নাই ?

এড্ । ক্যা মুক্কিল, পান্শো রুপেয়া দেঙ্গে ।

শান্তি । কে যাবে, তুমি নিজে যাবে ?

সাহেব তখন অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান লিগ্লে
নামক একজন যুবা এন্সাইনকে দেখাইয়া তাহাকে বলিলেন,
“লিগ্লে তুমি যাবে ?” লিগ্লে শান্তির রূপযৌবন দেখিয়া
বলিল, “আহ্লাদপূর্বক ।”

তখন ভারি একটা আরবী ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিলে
লিগ্লেও তৈয়ার হইল । শান্তিকে ধরিয়া ঘোড়ায় তুলিতে
গেল । শান্তি বলিল, “ছি, এত লোকের মাজখানে ? আমার
কি আর কিছু লজ্জা নাই ! আগে চল ছাউনি ছাড়াই ।”

লিগ্লে ঘোড়ায় চড়িল । ঘোড়া ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া
চলিল । শান্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া চলিল । এইরূপে তাহারা
শিবিরের বাহিরে আসিল ।

শিবিরের বাহিরে আসিলে নির্জন প্রান্তর পাইয়া, শান্তি
লিগ্লে'র পায়ের উপর পা দিয়া লাফে ঘোড়ায় চলিল । লিগ্লে
হাসিয়া বলিল, “তুমি যে পাকা ঘোড়সওয়ার ।”

শান্তি বলিল, “আমরা এমন পাকা ঘোড়সওয়ার, যে

তোমার সঙ্গে চড়িতে লজ্জা করে । ছি ! রেকাবপায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়া !”

একবার বড়াই করিবার জন্ত লিঙ্লে রেকাব হইতে পালইল । শান্তি অমনি নির্কোথ ইংরেজের গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল । শান্তি তখন অশ্বপৃষ্ঠে রীতিমত আনন গ্রহণ করিয়া ঘোড়ার পেটে মলের ঘা মারিয়া বায়ুবেগে আরবীকে ছুটাইয়া দিল । শান্তি চারিবৎসর সন্তান-সৈন্তের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া অশ্বারোহণবিদ্যাও শিখিয়াছিল । তা না শিখিলে জীবানন্দের সঙ্গে কি বাস করিতে পারিত ? লিঙ্লে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিলেন । শান্তি বায়ুবেগে অশ্বপৃষ্ঠে চলিল ।

যে বনে জীবানন্দ লুকাইয়াছিলেন, শান্তি সেই খানে গিয়া জীবানন্দকে সকল সংবাদ অবগত করাইল । জীবানন্দ বলিলেন, “তবে আমি শীঘ্র গিয়া, মহেন্দ্রকে সতর্ক করি । তুমি মেলায় গিয়া সত্যানন্দকে খবর দাও । তুমি ঘোড়ায় যাও—প্রভু যেন শীঘ্র সংবাদ পান । তখন দুই জনে দুই দিকে ধাবিত হইল । বলা বৃথা শান্তি আবার নবীনানন্দ হইল ।

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

এডওয়ার্ড্‌ন্ পাকা ইংরেজ । ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার লোক ছিল । শীঘ্র তাহার নিকটে খবর পৌঁছিল, যে সেই বৈষ্ণবীটা লিঙুলে সাহেবকে ফেলিয়া দিয়া আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে । শুনিয়াই এডওয়ার্ড্‌ন্ বলিলেন, “An imp of Satan ! Strike the tents.”

তখন ঠক্ ঠক্ খটা খট্ তাষুর খোঁটায় মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল । মেঘরচিত অমরাবতীর ত্রায় বস্ত্রনগরী অন্তর্হিতা হইল । মাল গাড়িতে বোঝাই হইল । মানুষ ঘোড়ায় অথবা আপনার পায়ে । হিন্দু মুসলমান মাদরাজী গোরা বন্দুক ঘাড়ে মনমস্ করিয়া চলিল । কামানের গাড়ি ঘড়োর ঘড়োর করিতে করিতে চলিল ।

এ দিকে মহেন্দ্র সন্তানসেনা লইয়া ক্রমে মেলার পথে অগ্রসর । সেই দিন বৈকালে মহেন্দ্র ভাবিল, বেলা পড়িয়া আসিল, শিবিরসংস্থাপন করা যাক্ ।

তখন শিবিরসংস্থাপন উচিত বোধ হইল । বৈষ্ণবের তাঁবু নাই । গাছতলায় গুণ চট বা কাঁথা পাতিয়া, শয়ন করে । একটু হরিচরণামৃত খাইয়া রাত্রিযাপন করে । ক্ষুধা যে টুকু থাকি থাকে, স্বপ্নে বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর অধরামৃত পান করিয়া পরিপূরণ করে । শিবিরোপযোগী নিকটে একটি স্থান ছিল । একটা বড় বাগান—আম কাঁটাল বাবলা তেঁতুল । মহেন্দ্র আঙ্গা দিলেন “এই খানেই শিবির কর ।” তারি পাশে একটা টিমা ছিল, উদ্ভিতে বড় বন্ধুর, মহেন্দ্র একবার ভাবিলেন, এ

পাহাড়ের উপর শিবির করিলেও হয় । স্থানটা দেখিয়া আসিবেন মনে করিলেন ।

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে টিলার উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি কিছু দূর উঠিলে পর এক যুবা যোদ্ধা বৈষ্ণবসেনার মতো প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, “চল, টিলায় চড় ।” নিকটে যাহারা ছিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল “কেন ?”

যোদ্ধা এক মৃত্তিকাস্তূপের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “চল এই জ্যোৎস্নারাত্রি ঐ পর্বতশিখরে, নূতন বসন্তের নূতন ফুলের গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে আজ আমাদের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে ।” সন্তানেরা দেখিল, সেনাপতি জীবানন্দ ।

তখন “হরে মুরারে” উচ্চ শব্দ করিয়া যাবতীয় সন্তানসেনা বল্লমে ভর করিয়া উচু হইয়া উঠিল ; এবং সেই সেনা জীবানন্দের অনুকরণ পৃষ্ণক বেগে টিলার উপর আরোহণ করিতে লাগিল । একজন সজ্জিত অশ্ব আনিয়া জীবানন্দকে দিল । দূর হইতে মহেন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইল । ভাবিল একি এ ? না বলিতে ইহারা আসে কেন ?

এই ভাবিয়া মহেন্দ্র ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া চাবুকের ঘায়ে ধোঁয়া উড়াইয়া দিয়া পর্বত অবতরণ করিতে লাগিলেন । সন্তানবাহিনীর অগ্রবর্তী জীবানন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ আবার কি আনন্দ ।”

জীবানন্দ হাসিয়া বলিলেন—“আজ বড় আনন্দ । টিলার ওপিঠে এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ সাহেব । যে আগে উপরে উঠবে তারি জিত ।”

তখন জীবানন্দ সন্তানসৈন্তের প্রতি ডাকিয়া বলিলেন—

“চেন তোমরা ! আমি জীবানন্দ গোস্বামী । সহস্র শত্রুর
প্রাণবধ করিয়াছি ।”

তুমুল নিনাদে কানন প্রান্তর সব ধ্বনিত করিয়া শব্দ হইল
“চিনি আমরা ! তুমি জীবানন্দ গোস্বামী ।”

জীব । বল “হরে মুরারে ।”

কানন প্রান্তর সহস্র সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, “হরে
মুরারে ।”

জীবা । টিলার ওপিঠে শক্র । আজ এই স্তূপশিখরে, এই
নীলাশ্রয়ী যামিনী সাক্ষাৎকার, সন্তানেরা রণ করিবে । দ্রুত
আইস, যে আগে শিখরে উঠিবে, সেই জিতিবে । বল, “বন্দে
মাতরম্ ।”

তখন কানন প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া গীতধ্বনি উঠিল “বন্দে
মাতরম্ ।” ধীরে ধীরে সন্তানসেনা পৰ্ব্বতশিখর আরোহণ
করিতে লাগিল ; কিন্তু তাহারা সহসা সভয়ে দেখিল, মহেন্দ্র
সিংহ অতি দ্রুতবেগে স্তূপ হইতে অবতরণ করিতে করিতে
তূর্য্যানিনাদ করিতেছেন । দেখিতে, দেখিতে শিখরদেশে
নীলাকাশপটে কামানশ্রেণী সহিত, ইংরেজের গোলন্দাজ সেনা
শোভিত হইয়াছে । উচ্চৈঃস্বরে বৈষ্ণবী সেনা গায়িল,—

“তুমি বিদ্যা তুমি ভক্তি,

তুমি না বাহুতে শক্তি

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে ।”

কিন্তু ইংরেজের কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্ শব্দে, সে
মহাগীতিশব্দ ভাসিয়া গেল । শত শত সন্তান হত আহত

হইয়া, অশ্ব অস্ত্র সহিত, টিলার উপর শুইল। আবার গুড়ুম্ গুম্. দধিচির অস্থিকে ব্যঙ্গ করিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া, ইংরেজের বজ্র গড়াইতে লাগিল। চামার কর্তনীসম্মুখে সুপক্ক ধাতের ত্রায় সন্তানসেনা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। বৃথায় জীবানন্দ, বৃথায় মহেন্দ্র যত্ন করিতে লাগিলেন। পতনশীল শিলারাশির ত্রায় সন্তানসেনা টিলা হইতে ফিরিতে লাগিল। কে কোথায় পলায় ঠিকানা নাই। তখন একেবারে সকলের বিনাশসাধনের জন্ত “হুর্রে ! হুর্রে !” শব্দ করিতে করিতে গোরার পল্টন টিলা হইতে নামিল। সঙ্গীন উচু করিয়া অতি দ্রুতবেগে, পর্কতবিমুক্ত বিশালতটিনী প্রপাতবৎ দুর্দমনীয় অলঙ্ঘ্য অজেয় ব্রটিশসেনা, পলায়নপর সন্তানসেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জীবানন্দ একবার মাত্র মহেন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিলেন, “আজ শেষ। এস এইখানেই মরি।”

মহেন্দ্র বলিলেন, “মরিলে যদি রণজয় হইত, তবে মরিতাম। বৃথা মৃত্যু বীরের ধর্ম্ম নহে।”

জীব। আমি বৃথাই মরিব। তবু যুদ্ধে মরিব। তখন পাছু ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে জীবানন্দ ডাকিলেন, “কে হরিনাম করিতে করিতে মরিতে চাও, আমার সঙ্গে আইস।”

অনেকে অগ্রসর হইল। জীবানন্দ বলিলেন, “অমন নহে। হরিসাক্ষাৎ শপথ কর, জীবন্তে ফিরিবে না।”

যাহারা আগু হইয়াছিল, তাহারা পিছাইল। জীবানন্দ বলিলেন, “কেহ আসিবে না? তবে আমি একা চলিলাম।”

জীবানন্দ অশ্বপৃষ্ঠে উচু হইয়া বহুদূর পশ্চাৎস্থিত মহেন্দ্রকে

ডাকিয়া বলিলেন, “ভাই! নবীনানন্দকে বলিও আমি চলিলাম। লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।”

এই বলিয়া সেই বীরপুরুষ লোহবৃষ্টিমধ্যে বেগে অশ্ব-চালন করিলেন। বামহস্তে বল্লম, দক্ষিণে বন্দুক, মুখে “হরে মুরারে! হরে মুরারে! হরে মুরারে!” যুদ্ধের সস্তাবনা নাই, এ সাহসে কোন ফল নাই—তথাপি “হরে মুরারে! হরে মুরারে!” গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ শত্রুবাহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পলায়নপর সন্তানদিগকে মহেন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ, একবার তোমরা ফিরিয়া জীবানন্দ গোসাইকে দেখ। দেখিলে মরিবে না।”

ফিরিয়া কতকগুলি সন্তান জীবানন্দের অমানুষী কীর্তি দেখিল; প্রথমে বিস্মিত হইল, তার পর বলিল, “জীবানন্দ মরিতে জানে, আমরা জানি না? চল জীবানন্দের সঙ্গে আমরাও বৈকুণ্ঠে যাই।”

এই কথা শুনিয়া, কতকগুলি সন্তান ফিরিল! তাহাদের দেখাদেখি আর কতকগুলি ফিরিল, তাহাদের দেখাদেখি আরও কতকগুলি ফিরিল। বড় একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। জীবানন্দ শত্রুবাহ প্রবেশ করিয়াছিলেন; সন্তানেরা আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

এ দিকে সমস্ত রণক্ষেত্র হইতে সন্তানগণ দেখিতে পাইল যে কতক সন্তানেরা আবার ফিরিতেছে। সকলেই মনে করিল সন্তানের জয় হইয়াছে; সন্তান, শত্রুকে তাড়াইয়া যাইতেছে। তখন সমস্ত সন্তানসৈন্য “মার মার” শব্দে ফিরিয়া ইংরেজসৈন্যের উপর ধাবিত হইল।

এদিকে ইংরেজসেনার মধ্যে একটা ভারী হুলুস্থল পড়িয়া

গেল। সিপাহীরা যুদ্ধে আর যত্ন না করিয়া ছই পাশ দিয়া পলাইতেছে; গোরারাও ফিরিয়া সঙ্গীন খাড়া করিয়া শিবিরামুখে ধাবমান হইতেছে। ইতস্ততঃ নিবীক্ষণ করিয়া মহেন্দ্র দেখিলেন, টিলার শিখরে অসংখ্য সন্তানসেনা দেখা যাইতেছে। তাহারা বীরদর্পে অবতরণ করিয়া ইংরেজসেনা আক্রমণ করিতেছে। তখন ডাকিয়া সন্তানগণকে বলিলেন,—

“সন্তানগণ! ঐ দেখ শিখরে প্রভু সত্যানন্দ গোস্বামীয় ধ্বজা দেখা যাইতেছে। আজ স্বয়ং মুরারি মধুটেকটভনিসুদন কংশকেশি-বিনাশন, রণে অবতীর্ণ, লক্ষ সন্তান স্তূপপৃষ্ঠে। বল হরে মুরারে! হরে মুরারে! উঠ! মুসলমানের বুক পিঠে চাপিয়া মার! লক্ষ সন্তান টিলার পিঠে।”

তখন হরে মুরারের ভীষণ ধ্বনিতে কানন প্রান্তর মথিত হইতে লাগিল। সকল সন্তান মাঠে মাঠে রবে ললিত-তালধ্বনিসম্বলিত অন্তের ঝঙ্কনায় সর্বজীব বিমোহিত করিল। তেজে মহেন্দ্রের বাহিনী উপরে আরোহণ করিতে লাগিল। শিলাপ্রতিঘাতপ্রতিপ্রেরিত নির্ঝরিণীবৎ রাজসেনা বিলোড়িত, স্তম্ভিত, ভীত হইল। সেই সময়ে পঞ্চবিংশতি সহস্র সন্তানসেনা লইয়া সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী শিখর হইতে সমুদ্রপ্রপাতবৎ তাহাদের উপর বিক্ষিপ্ত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ হইল।

যেমন ছই খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সজ্বর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি ছই সন্তানসেনা সজ্বর্ষে সেই বিশাল রাজসৈন্য, নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

পূর্ণিমার রাত্রি !—সেই ভীষণ রণক্ষেত্র এখন স্থির । সেই ঘোড়ার দড়বড়ি, বন্দুকের কড়কড়ি, কামানের গুম্ গুম্—সর্ব-ব্যাপী ধুম, আর কিছুই নাই । কেহ ছর্রে বলিতেছে না— কেহ হরিধ্বনি করিতেছে না । শব্দ করিতেছে—কেবল শৃগাল, কুকুর, গৃধিনী । সর্বোপরি আহত ব্যক্তির ক্ষণিক আর্তনাদ । কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ ভগ্নমস্তক, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে. কাহারও পঞ্জর বিদ্ধ হইয়াছে, কেহ ঘোড়ার নীচে পড়িয়াছে । কেহ ডাকিতেছে “মা ।” কেহ ডাকিতেছে ‘বাপ !’ কেহ চায় জল, কাহারও কামনা মৃত্যু । বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজ, মুসলমান, একত্র জড়াজড়ি ; জীবন্তে মৃত, মনুষ্যে অশ্বে, মিশামিশি ঠেসাঠেসি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । সেই মাঘ মাসের পূর্ণিমার রাত্রে, দারুণ শীতে, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে রণভূমি অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল । সেখানে আসিতে কাহারও সাহস হয় না ।

কাহারও সাহস হয় না, কিন্তু নিশীথকালে এক রমণী সেই অগম্য রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিল । একটা মশাল জালিয়া সেই শবরাশির মধ্যে সে কি খুঁজিতেছিল । প্রত্যেক মৃতদেহের মুখের কাছে মশাল লইয়া মুখ দেখিয়া, আবার অন্য শবের কাছে মশাল লইয়া যাইতেছিল । কোথায়, কোন নরদেহ মৃত অশ্বের নীচে পড়িয়াছে ; সেখানে যুবতী,

মশাল মাটিতে রাখিয়া, অশ্বটী দুই হাতে সরাইয়া নরদেহ উদ্ধার করিতেছিল। তার পর যখন দেখিতে পার, যে যাকে খুঁজিতেছে সে নয়, তখন মশাল তুলিয়া সরিয়া যায়। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া, যুবতী সকল মাঠ ফিরিল—যা খুঁজে তা কোথাও পাইল না। তখন মশাল ফেলিয়া, সেই শবরাশিপূর্ণ রুধিরাক্ত ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শান্তি; জীবানন্দের দেহ খুঁজিতেছিল।

শান্তি লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে এক অতি মধুর সক্রোধধ্বনি তাহার কর্ণরঞ্জে প্রবেশ করিল। কে যেন বলিতেছে “উঠ মা! কাঁদিও না।” শান্তি চাহিয়া দেখিল—দেখিল সম্মুখে জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া, এক অপূৰ্ণ দৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাজুটধারী মহাপুরুষ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। যিনি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, “কাঁদিও না মা! জীবানন্দের দেহ আমি খুঁজিয়া দিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে আইস।”

তখন সেই পুরুষ শান্তিকে রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন; সেখানে অসংখ্য শবরাশি উপর্যুপরি পড়িয়াছে। শান্তি তাহা সকল নাড়িতে পারে নাই। সেই শবরাশি নাড়িয়া সেই মহাবলবান্ পুরুষ এক মৃতদেহ বাহির করিলেন। শান্তি চিনিল সেই জীবানন্দের দেহ। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রুধিরে পরিপ্লুত। শান্তি, সামান্য স্ত্রীলোকের ঞায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

আবার তিনি বলিলেন, “কাঁদিও না মা! জীবানন্দ কি মরিয়াছে? স্থির হইয়া উহার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখ। আগে নাড়ী দেখ।”

শান্তি শবের নাড়ী টিপিয়া দেখিল কিছু মাত্র গতি নাই ।
সেই পুরুষ বলিলেন, “বুকে হাত দিয়া দেখ ।”

যেখানে হৃৎপিণ্ড, শান্তি সেইখানে হাত দিয়া দেখিল, কিছু-
মাত্র গতি নাই ; সব শীতল ।

সেই পুরুষ আবার বলিলেন, “নাকের কাছে হাত দিয়া দেখ
—কিছুমাত্র নিঃশ্বাস বহিতেছে কি ?”

শান্তি দেখিল, কিছুমাত্র না ।

সেই পুরুষ বলিলেন, “আবার দেখ, মুখের ভিতর অঙ্গুলি
দিয়া দেখ—কিছুমাত্র উষ্ণতা আছে কি না ?” শান্তি অঙ্গুলি
দিয়া দেখিয়া বলিল, “বুঝিতে পারিতেছি না ।” শান্তি আশা-
মুগ্ধ হইয়াছিল ।

মহাপুরুষ, বাম হস্তে জীবানন্দের দেহ স্পর্শ করিলেন ।
বলিলেন “তুমি ভয়ে হতাশ হইয়াছ ! তাই বুঝিতে পারিতেছ
না—শরীরে কিছু তাপ এখনও আছে বোধ হইতেছে । আবার
দেখ দেখি ।”

শান্তি তখন আবার নাড়ী দেখিল, কিছু গতি আছে । বিস্মিত
হইয়া হৃৎপিণ্ডের উপরে হাত রাখিল—একটু ধক্ ধক্ করি-
তেছে ! নাকের আগে অঙ্গুলি রাখিল—একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে !
মুখের ভিতর অঙ্গুলি রাখিয়া গেল । শান্তি বিস্মিত হইয়া
বলিল, “প্রাণ ছিল কি ? না আবার আসিয়াছে ?”

তিনি বলিলেন, “তাও কি হয় মা ! তুমি উহাকে বহিয়া
পুষ্করিণীতে আনিতে পারিবে ? আমি চিকিৎসক, উহার
চিকিৎসা করিব ।”

শান্তি অনায়াসে জীবানন্দকে কোলে তুলিয়া পুকুরের দিকে

লইয়া চলিল। চিকিৎসক বলিলেন, “তুমি ইহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া রক্ত সকল ধুইয়া দাও। আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।”

শান্তি জীবানন্দকে পুষ্করিণীতীরে লইয়া গিয়া রক্ত ধোত করিল। তখনই চিকিৎসক বস্ত্র লতা পাতার প্রলেপ লইয়া আসিয়া সকল ক্ষতমুখে দিলেন। তার পর, বারংবার জীবানন্দের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইলেন। তখন জীবানন্দ এক দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। শান্তির মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “যুদ্ধে কার জয় হইল?”

শান্তি বলিল, “তোমারই জয়। এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।”

তখন উভয়ে দেখিল কেহ কোথাও নাই! কাহাকে প্রণাম করিবে?

নিকটে বিজয়ী সন্তানসেনার বিষম কোলাহল শুনা যাইতেছিল, কিন্তু শান্তি বা জীবানন্দ কেহই উঠিল না—সেই পূর্ণচন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া রহিল। জীবানন্দের শরীর ঔষধের গুণে, অতি অল্প সময়েই সুস্থ হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, “শান্তি! সেই চিকিৎসকের ঔষধের আশ্চর্য্য গুণ! আমার শরীরের আর কোন বেদনা বা গ্লানি নাই—এখন কোথায় যাইবে চল। ঐ সন্তানসেনার জয়ের উৎসবের গোল শুনা যাইতেছে।”

শান্তি বলিল, “আর ওখানে না। মার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে—এ দেশ সন্তানের হইয়াছে। আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না—এখন আর কি করিতে যাইব?”

জী। যা কাড়িয়া লইয়াছি, তা বাহুবলে রাখিতে হইবে।

শা। রাখিবার জন্ত মহেন্দ্র আছেন, সত্যানন্দ স্বয়ং আছেন ।
তুমি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্তানধর্মের জন্ত দেহত্যাগ করিয়াছিলে ।
এ পুনঃপ্রাপ্ত দেহে সন্তানের আর কোন অধিকার নাই । আমরা
সন্তানের পক্ষে মরিয়াছি । এখন আমাদের দেখিলে সন্তানেরা
বলিবে “জীবানন্দ যুদ্ধের সময়ে প্রায়শ্চিত্তভরে লুকাইয়াছিল, জয়
হইয়াছে দেখিয়া রাজ্যের ভাগ লইতে আসিয়াছে ।”

জী। সে কি শাস্তি ? লোকের অপবাদভয়ে আপনার
কাজ ছাড়িব ? আমার কাজ মাতৃসেবা, যে যা বলুক না কেন,
আমি মাতৃসেবাই করিব ।

শা। তাহাতে তোমার আর অধিকার নাই—কেন না
তোমার দেহ মাতৃসেবার জন্ত পরিত্যাগ করিয়াছ । যদি আবার
মার সেবা করিতে পাইলে, তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত কি হইল ?
মাতৃসেবায় বঞ্চিত হওয়াই, এ প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ ।
নহিলে শুধু তুচ্ছ প্রাণ পরিত্যাগ কি বড় একটা ভারী কাজ ?

জী। শাস্তি ! তুমিই মার বুদ্ধিতে পার । আমি এ প্রায়-
শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিব না । আমার সুখ সন্তানধর্মের—সে সুখে
আমাকে বঞ্চিত করিব । কিন্তু যাইব কোথায় ? মাতৃসেবা
ত্যাগ করিয়া, গৃহে গিয়া ত সুখভোগ করা হইবে না ।

শা। তা কি আমি বলিতেছি ? ছি ! আমরা আর গৃহী
নহি ; এমনই দুইজনে সন্ন্যাসীই থাকিব—চিরব্রহ্মচর্য্য পালন
করিব । চল, এখন গিয়া আমরা দেশে দেশে তীর্থদর্শন করিয়া
বেড়াই ।

জী। তার পর ?

শা। তার পর—হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া

ছইজনে দেবতার আরাধনা করিব—যাতে মার মঙ্গল হয়, সেই বর মাগিব ।

তখন ছইজনে উঠিয়া, হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময় নিশীথে অনন্তে অন্তর্হিত হইল ।

হায় ! আবার আসিবে কি মা ! জীবানন্দের ঞ্চার পুত্র, শান্তির ঞ্চার কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি ?

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

সত্যানন্দ ঠাকুর রণক্ষেত্র হইতে কাহাকে কিছু না বলিয়া আনন্দমঠে চলিয়া আসিলেন । সেখানে গভীর রাত্রে, বিষ্ণু-মণ্ডপে বসিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত । এমন সময়ে সেই চিকিৎসক সেখানে আসিয়া দেখা দিলেন । দেখিয়া, সত্যানন্দ উঠিয়া প্রণাম করিলেন ।

চিকিৎসক বলিলেন, “সত্যানন্দ, আজ মাঘী পূর্ণিমা ।”

সত্য । চলুন—আমি প্রস্তুত আছি । কিন্তু হে মহাত্মন!—আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন । আমি যে মুহূর্তে যুদ্ধ জয় করিয়া সনাতনধর্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল ?

বিনি আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, “তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে । আর তোমার এখন কোন কার্য নাই । অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই ।”

সত্য । মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল ।

তিনি। হিন্দুরাজ্য এখন স্থাপিত হইবে না—তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে। অতএব চল।

শুনিয়া সত্যানন্দ তীব্র মর্শ্বপীড়ায় কাতর হইলেন। বলিলেন “হে প্রভু! যদি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইবে না, তবে কে রাজা হইবে? আবার কি মুসলমান রাজা হইবে?”

তিনি বলিলেন, “না, এখন ইংরেজ রাজা হইবে।”

সত্যানন্দের দুই চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া ঘোড়াহাতে বাষ্পনিকরুদ্বন্দ্বরে বলিতে লাগিলেন, “হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি শ্বেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!”

চিকিৎসক বলিলেন, “সত্যানন্দ কাতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, এ কথা আমি তোমাকে সেইরূপ বুঝাই। মনোযোগ দিয়া শুন। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম—শ্বেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে

জ্ঞান, সেই সনাতনধর্মের প্রধান ভাগ । কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই । স্থূল কি তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না । এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্মও লোপ পাইয়াছে । সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যিক । এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই ; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি । অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে । ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক-শিক্ষায় বড় সুপটু । সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব । ইংরেজি শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তবে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে । তখন সনাতনধর্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না । তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্ধীপ্ত হইবে । যতদিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে । ইংরেজরাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্ম্যাচরণ করিবে । অতএব হে বুদ্ধিমন্—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর ।”

সত্যানন্দ বলিলেন, “হে মহাত্মন! যদি ইংরেজকে রাজা করাই আপনাদের অভিপ্রায়, যদি এ সময়ে ইংরেজের রাজ্যই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর, তবে আমরাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্যে কেন নিবৃত্ত করিয়াছিলেন ?”

মহাপুরুষ বলিলেন, “ইংরেজ এক্ষণে বণিক—অর্থসংগ্রাহেই

মন, রাজ্যশাসনের ভার লইতে চাহে না। এই সন্তান-বিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে, কেন না রাজ্যশাসন ব্যতীত স্বার্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আইস—জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি স্বয়ং সকল কথা বুঝিতে পারিবে।”

সত্যানন্দ । হে মহাত্মন—আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না—জ্ঞানে আমার কাজ নাই—আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্বাদ করুন আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ । ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ—ইংরেজরাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শশুশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।

সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, “শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শশুশালিনী করিব।”

মহাপুরুষ । শত্রু কে ? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র-রাজ্য। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।

সত্যানন্দ । না থাকে, এইখানে এই মাতৃপ্রতিমাসম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ । অজ্ঞানে ? চল জ্ঞানলাভ করিবে চল। হিমালয়-শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্তি দেখাইব।

এই বলিয়া মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরিলেন । কি অপূর্ব শোভা ! সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ-মূর্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ ছই পুরুষ-মূর্তি শোভিত—একে অন্নের হাত ধরিয়াছেন । কে কাহাকে ধরিয়াছে ? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে ; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে ; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে ! এই সত্যানন্দ শান্তি ; এই মহাপুরুষ কল্যাণী । সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন ।

বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল ।

—
সমাপ্ত ।

APPENDIX I.

HISTORY OF THE SANNYASI REBELLION.

*From Warren Hastings' Letters in
Gleig's Memoirs.*

You will hear of great disturbances committed by the Sannyasis, or wandering Fakeers who annually infest the province, about this time of the year in pilgrimages to Jaggernaut, going in bodies of 1000 and some times even 10,000 men. An officer of reputation (Captain Thomas) lost his life in an unequal attack upon a party of these banditti, about 3000 of them, near Rungpore with a small party of Pergona Sepoys, which has made them more talked of than they deserve. The revenue, however, has felt the effects of their ravages in the northern districts. The new establishment of Sepoys which is now forming on the plan enjoined by the Court of Directors and the distribution of them ordered for the internal protection of the provinces will, I hope, effectually secure them hereafter from these incursions.—*Hastings to Sir George Colebrooke—dated 2nd February 1773.—Gleig's Memoirs Vol. I. 282.*

Our own provinces has worn something of a

warlike appearance this year, having been infested by a band of Sannassies, who have defeated two small parties of purgunnah Sepoys (a rascally corps) and cut off the two officers who commanded them. One was Captain Thomas, whom you know. Four battalions of the brigade Sepoys are now in pursuit of them, but they will not stand any engagement and have neither camp equipage, nor even clothes, to retard their flight. Yet I hope we shall yet make an example of some of them as they are shut in by rivers which they can not pass when closely pursued.

The history of the people is curious. They inhabit or rather possess the country lying south of the hills of Tibbet from Caubul to China. They go mostly naked; they have neither towns, houses nor families; but rove continually from place to place, recruiting their number with the healthiest children they can steal in the countries through which they pass. Thus they are the stoutest and the most active men in India. Many are merchants. They are all pilgrims, and held by all castes of Gentoos in great veneration. This infatuation prevents our obtaining any intelligence of their motions or aid from the country against them, notwithstanding very rigid orders which have been published for these purposes, in so much that they often appear in the heart of the province as if they dropt from heaven. They

are hardy, bold, and enthusiastic to a degree surpassing credit. Such are the Sannassies, the Gipsies of Hindostan.

We have dissolved all the Purgunnah Sepoys and fixed stations of the brigade Sepoys on our frontiers, which are to be employed only in the defence of the provinces, and to be relieved every three months. This I hope will secure the peace of the country against future irruptions, and as they are no longer to be employed in the collections, the people will be freed from the oppressions of our own plunderers. "*Hastings to Josias Du Pre. —9th March 1773.*"

We have lately been much troubled here by hordes of desperate adventurers called Sannasis, who have overrun the province in great numbers and committed great depredations. The particulars of these disturbances and of our endeavours to repel them you will find in our general letters and consultations, which will acquit the Government of any degree of blame from such a calamity. At this time we have five battalions of Sepoys in pursuit of them, and I have still hopes of exacting ample vengeance for the mischief they have done us, as they have no advantage over us but in the speed with which they fly from us. A minute relation of these adventures can not amuse you, nor indeed are they of great moment, for which reason give me leave to drop the sub-

ject, and lead you to one in which you can not but be more interested &c. *Hastings to Purling—dated 31st March 1773—para 4—Gleig's Memoirs of Hastings.—294 Vol. I.*

In my last I mentioned that we had every reason to suppose the Sannasie Fakeers had entirely evacuated the company's possessions. Such were the advices I then received, and their usual progress made this highly probable. But it seems they were either disappointed in crossing the Burramputrah river, or they changed their intention, and returned in several bands of about 2000 or 3000 each, appearing unexpectedly in different parts of the Rungpoor and Dinagepoor provinces. For in spite of the strictest orders issued and the severest penalties threatened to the inhabitants in case they fail in giving intelligence of the approach of the Sennassies, they are so infatuated by superstition as to be backward in giving the informaton, so that the banditti are sometimes advanced into the very heart of provinces before we know any thing of their motions; as if they dropt from heaven to punish the inhabitants for their folly. One of these parties falling in with a small detachment commanded by Captain Edwardes, an engagement ensued wherein our Sepoys gave way, and Captain Edwardes lost his life in endeavouring to cross a Nullah. This detachment was formed of the worst of our

perganna Sepoys, who seemed to have behaved very ill. This success elated the Sennassies, and they heard of their depredations from every quarter in those districts. Captain Stewart, with the nineteenth battalion of Sepoys who was before employed against them, was vigilant in the pursuit wherever he could hear of them, but to no purpose. They were gone before he could reach the places to which he was directed. I ordered another battalion from Burrampoor to march immediately to co-operate with Captain Stewart but to act separately in order to have the better chance of falling in with them. At the same time I ordered another battalion to march from the Dinapoor Station through Tyroot and by the northern frontier of the Purneah province, following the track which the Sennassies usually took, in order to intercept them in case they marched that way. This battalion after acting against the Sennassies, if occasion offered, was directed to pursue their march to Cooch Behar, where they are to join Captain Jones and assist in the reduction of that country.

Several parties of the Sennassies having entered into the Purneah province, burning and destroying many villages there, the collector applied to Captain Brook who had just arrived at Pavity near Rajmahl, with his newly raised battalion of light infantry. That officer immediately crossed the river and entered upon measures against

